যুগাবতার

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীমতী গুপ্ত

সাহিত্যরূপা
৮১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রকাশিকা :
গৌরী দেবী
সাহিত্যরূপা
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭

পরিবেশক :
নির্মল পুস্তকালয়
১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : লা বৈশাখ, ১৩৫৭

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
শ্রীসত্য চক্রবর্তী

মুদ্রাকর :
শ্রীঅজিত কুমার সামই
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১/১এ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

পরম পূজনীয়—

জ্যাঠামশাই, জ্যাঠাইমা

ও

স্নেহের জগন্নাথকে

শ্রীমতী গুপ্ত'র অন্যান্য রচনা :

পরমাপ্রকৃতি সারদামণি

বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ

ভগিনী নিবেদিতা

ভূমিকা

যাঁর লীলার আদি নেই, অন্ত নেই, সেই যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনলীলা এই সামান্য পুস্তকে প্রকাশ করা অসম্ভব এবং সে দুঃসাহসও আমার নেই। তবুও এই দুরূহ সাধনায় ব্রতী হয়েছি শুধু তাঁরই আশির্বাদে, নইলে হতো না। এমনই তাঁর নামের মাহাত্ম্য, যা আমি অনুভব করেছি লিখতে বসে। সে শুধু অনুভব। সে শুধু তাঁরই দয়া। আমার আগে যে সকল পুণ্যাত্মা লেখক, লেখিকারা ঠাকুরেব সম্বন্ধে লিখে বরণীয় হয়েছেন তাঁদের সেইসব অমূল্য রচনার কিছু কিছু সংগ্রহ করে আজ এই সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পেরেছি। তাই তাঁদের সকলের কাছে অবনতমস্তকে ঋণ স্বীকার করে ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রণাম জানাচ্ছি।

হুগলী জেলার একটি সাধারণ গ্রাম কামারপুকুর।

প্রকৃতির অকৃপণ হাতের দানে শান্ত সমৃদ্ধ গ্রামের সুশীতল ছায়ায় গ্রামবাসীরা বেশ শান্তিতেই বাস করে।

এই গ্রামের একটি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মেছিলেন ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মণের সকল গুণই ক্ষুদিরামের চরিত্রে শতদলের মতই বিকশিত।

ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পত্নী চন্দ্রমণি দেবী।

গ্রামের লোক ভক্তিতে শ্রদ্ধায় নত হয়ে থাকে।

সারা বাড়ীটাতে যেন একটা পবিত্র স্বর্গীয় পরিবেশ।

ক্ষুদিরামের সংসার চলে দুঃখে সুখে মিশিয়ে। যা কিছু সহায় সম্পত্তি ছিল তাও জমিদারের কোপে একে একে নিঃশেষ হয়ে যায়।

অভাব অভিযোগ ক্রমশঃ যেন চেপে বসতে থাকে। কিন্তু একমূহূর্তের জন্য মিথ্যা প্রবঞ্চনার ছায়াও স্পর্শ করতে পারেনি এই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে।

পরম পতিব্রতা চন্দ্রমণিরও মুখে সদা তৃপ্তির হাসিটুকু লেগে থাকতো।

যেন কোন দুঃখই দুঃখ দিতে পারে না এই পরিবারকে।

ক্ষুদিরাম সারাদিন ঘুরে বেড়ান সত্যের পথের ব্রাহ্মণোচিত কর্মের সন্ধানে। দারুণ গ্রীষ্মের দুপুরে কাঠফাটা রোদেও বিশ্রাম নেই তাঁর চেষ্টার। এক গ্রাম থেকে ফিরছেন অন্য গ্রামে।

চলতে চলতে অবশ হয়ে আসে পা দুখানা। শ্রান্তি জড়ানো

অবসাদগ্রস্ত দেহটিকে টেনে টেনে একটা গাছতলায় এসে বসেন বিশ্রামের আশায়।

সামনে শূন্য বিস্তীর্ণ প্রান্তর। আগুনের মত জ্বলন্ত রোদের দিকে তাকানো যায় না। ক্ষুদিরাম চোখ বন্ধ করেন। তারপর ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লেন শান্ত প্রকৃতির স্নেহমাখানো ঠাণ্ডা হাওয়ার পরশ পেয়ে।

ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখলেন ক্ষুদিরাম—একটি কিশোর বালক এগিয়ে এসেছে তাঁর কাছে। ক্ষুদিরাম বার বার দেখলেন, কিশোর বেশে স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র।

তিনি ক্ষুদিরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন,—দেখ, ঐখানটায় বহুদিন ধরে আমি বড় অযত্নে রয়েছি। তুই নিয়ে গিয়ে আমাকে পুত্রস্নেহে পালন কর।

ঘুম ভেঙ্গে ক্ষুদিরাম চমকে উঠে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। একি অদ্ভুত স্বপ্ন। একি সত্যিই স্বপ্ন না মনোবিকার। আবার ভাবলেন, মনোবিকার হতেই পারে না। আগে দেখাই যাক স্বপ্নাদিষ্ট জায়গাটি।

ধীরে ধীরে সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালেন, যে জায়গাটি স্বপ্নের মধ্যে কিশোর শ্রীরামচন্দ্র দেখিয়েছিলেন।

অবাক বিস্ময়ে ক্ষুদিরাম তাকিয়ে দেখেন অপরূপ একটি শালগ্রাম শিলা রয়েছে, আর তাঁকে ঘিরে বিরাট ফণা উদ্যত করে পাহারা দিচ্ছে একটি সাপ।

বিস্মিত ক্ষুদিরাম শালগ্রাম শিলাটি গ্রহণ করবার কথা মনে করতেই সাপটি শিলা ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হলো।

পরম ভক্তিভরে ক্ষুদিরাম তুলে নিলেন সেই শালগ্রাম শিলাকে।

বার বার নেড়ে চেড়ে দেখে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন—এটি আসল রঘুবীর শিলা। পরমানন্দে ঘরে ফিরে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন শালগ্রাম।

তারপর নিয়মিত পূজা অর্চনাও করতে থাকেন তিনি।

কিন্তু তবুও ক্ষুদিরামের সংসারের অভাব এতটুকু কমলো না।

শত দুঃখেও ক্ষুদিরাম সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুৎ হন না। সমস্ত কিছু ঈশ্বর চরণে অর্পণ করে শুধু কাজ করে যেতে লাগলেন।

ধীরে ধীরে ক্ষুদিরাম নানাপ্রকার দিব্যদর্শন করতে লাগলেন। যার জন্যে অন্য সকলের কাছে অতি প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

তেমনি ছিলেন চন্দ্রমণি দেবী। তিনিও আপন গুণে গ্রামের সকলের মনের মধ্যে দেবীর আসন পেয়েছিলেন।

* * *

ক্ষুদিরামবাবু সেবার গয়াতে গেলেন পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করতে। সেখানে পৌঁছে স্বপ্ন দেখেন তিনি—"তিনি পিণ্ড নিবেদন করছেন আর তাঁর পিতৃপুরুষেরা জ্যোতির্ময় শরীর ধারণ করে এসে গ্রহণ করছেন, তার মধ্যে এক মহাজ্যোতির্ময় নবদুর্বাদল কান্তি দেবপুরুষ এগিয়ে এসে বললেন,—ক্ষুদিরাম! তোমার ভক্তিতে আমি তুষ্ট হয়েছি। আমি তোমার ছেলেরূপে সেবা গ্রহণ করবো।

হৃষ্টমনে পিণ্ডদান শেষে বাড়ী ফিরে এলেন ক্ষুদিরাম। স্বপ্নের কথা ভাবতে লাগলেন অবিরাম।

সেদিন চন্দ্রমণি দেবীও বললেন,—আমি একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি।

অবাক হয়ে তাকালেন ক্ষুদিরাম। বললেন,—কি দেখেছ তুমি?

দেখলাম এক দেবপুরুষ যেন আমার পাশে শুয়ে রয়েছেন। ঘুম ভেঙ্গে উঠে আর কাউকে দেখতে পেলাম না। তাছাড়া সেদিন শিবমন্দিরের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় মনে হলো মহাদেবের শরীর থেকে একটা জ্যোতি বেরিয়ে এসে আমার শরীরে মিশে গেল। তারপর থেকে মনে হচ্ছে আমি অন্তঃসত্বা।

সব শুনে ক্ষুদিরামের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। স্ত্রীকে বললেন, এমনি স্বপ্ন বা দিব্যদর্শনের কথা আর কাউকে বলো না। ঈশ্বরের কৃপায় আমরা এক দেবসন্তান লাভ করবো।

চন্দ্রমণি কিছু বল্লেন না। চুপ করে থাকেন। কিন্তু এক স্বর্গীয় পুলকে পুলকিত হয়ে ওঠেন তিনি। ধীরে ধীরে দেবীর মত রূপ লাবণ্যে জ্যোতির্ময়ী হয়ে উঠতে লাগলেন।

এমনি করে দিন কাটে।

স্বামী-স্ত্রী উভয়েই মনে মনে কল্পনার জাল বোনেন। ভবিষ্যতের কথা ভাবেন। অপেক্ষা করতে থাকেন সেই পরম লগ্নটির।

অবশেষে সেই লগ্ন সমাগত হলো।

দৈবী পুলকে শিউরে ওঠেন চন্দ্রমণি দেবী।

১৮৪১ সনের ফাল্গুন মাসের ছয় তারিখ।

বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে প্রকৃতির বুকে নবীন বসন্তের ছোঁয়া লেগে নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে।

রাত তখনো পোয়ায় নি। দিকে দিকে ব্রাহ্মমুহূর্তের স্নিগ্ধ পবিত্রতা।

সেই মুহূর্তে পরম জ্যোতির্ময় এক দেবশিশু চন্দ্রমণি দেবীর কোল আলো করে ভূমিষ্ঠ হলো।

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন চন্দ্রমণি দেবী। আর ক্ষুদিরাম বসলেন পাঁজা নিয়ে।

বহুক্ষণ গণনা করে অবাক হলেন তিনি। স্বয়ং নারায়ণের অংশ থেকে জন্ম এ শিশুর। মহাপুরুষ বলে খ্যাতিলাভ করবে এই শিশু। নারায়ণের মতো পূজো পাবে মানবের ঘরে ঘরে।

শুভক্ষণে ছেলের নামকরণ হলো। ক্ষুদিরাম নাম রাখলেন গদাধর।

ধীরে ধীরে গদাধর বড় হতে থাকে।

বাবা মায়ের অসীম স্নেহ পরিচর্যার এতটুকু ত্রুটি নেই। দুজনেই মাঝে মাঝে নানা অলৌকিক দিব্যদর্শন করেন।

গদাধরের বয়স তখন আট মাস। চন্দ্রমণি দেবী তাকে মশারীর মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে রেখে সাংসারিক ক্রিয়া কর্মে ব্যস্ত। হঠাৎ একসময় ছেলেকে একনজর দেখতে এলেন ঘরে।

কিন্তু ছেলে কোথায়? তার বিছানায় শুয়ে আছে বিরাট দেহধারী এক পুরুষ।

আঁৎকে উঠে চন্দ্রমণি ছুটলেন স্বামীর কাছে। বললেন সব কথা। ক্ষুদিরাম তাঁকে নিরস্ত করে বললেন,—চুপ চুপ। ছেলে তোমার যে সে নয়, স্বয়ং রঘুবীর শরীরী হয়েছেন।

চন্দ্রমণি মনে মনে নারায়ণকে প্রণাম করে আবার গৃহস্থালীতে মন দিলেন।

দেখতে দেখতে গদাধর পাঁচ বছরের হলো।

ক্ষুদিরাম উপযুক্ত সময় বুঝে মুখে মুখে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করলেন। কিন্তু ক্রমশই বালকের স্মরণশক্তি দেখে অবাক হয়ে যান। রামায়ণ মহাভারতের যে কোনো অংশ, যে কোনো দেব-দেবীর স্তোত্র-মন্ত্র একটিবার শুনলেই আশ্চর্য রকম মুখস্থ হয়ে যায় গদাধরের।

কিন্তু যত গণ্ডগোল বাধল নামতার বেলায়।

শতচেষ্টা করেও নামতা মুখস্থ করতে পারে না গদাধর।

এরপর শুরু হলো পাঠশালার বিদ্যা। সেখানেও একই অবস্থা। একমাত্র অঙ্ক ছাড়া প্রত্যেকটি বিষয়ে আশ্চর্য রকম সফলতা।

রীতিমত পারদর্শী হয়ে ওঠে গদাধর।

শুধু লেখা পড়া নয়। যে কোনো কাজ একবার নিজের চোখে দেখলেই তা আর ভুলবার নয়। এমন কি, কুমোরবাড়ী গিয়ে

দুদিন দাঁড়িয়ে ঠাকুর প্রতিমা তৈরী করতে দেখে পরদিনই বাড়ীতে এসে হুবহু ছোট্ট প্রতিমা তৈরী করে ফেলে। দেখে-শুনে সকলে বিস্মিত হয়।

তারপর শিখে ফেলে চিত্রাঙ্কন। এমনি করে শুনে শুনেই পুরাণ পাঠ্য যে কোন শাস্ত্রের ব্যাখা। যাত্রাগান প্রভৃতি আয়ত্ব করে নিতে থাকে বালক গদাধর।

গদাধরের চরিত্রের একাধিক গুণ সকলকে মুগ্ধ করতো। যেমন মিশুকে তেমনি কৌতুকপ্রিয়। আবার ততোধিক দুরন্ত। একেবারে ভয়ের লেশমাত্র নেই। সদাসর্বদা প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ।

এই হলো একটা দিক।

অন্যদিকে হিমালয়কেও হার মানায় গদাধরের অচল অটল একাগ্রতায়! এক এক সময় কী যেন এক ভাবের বশে বিভোর হয়ে যায় গদাধর। তখন যেন বাহ্য-জ্ঞান থাকে না।

কখনো বা আকাশের নীল রঙের দিকে তাকিয়ে, কখনো বা পাখীর ডাক শুনতে শুনতে এমনি ধ্যানস্থ হয়ে পড়তো বালক গদাধর।

হঠাৎ খবর এলো গদাধর মাঠের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। ছুটে গেলেন ক্ষুদিরাম। কোলে করে তুলে বাড়ী নিয়ে এলেন। সকলে ভাবে এটা অসুখ। কিন্তু গদাধর বলে, না না নীল আকাশে সাদা সাদা পাখীগুলো কেমন সুন্দর উড়ে চলেছিল, তারপর হঠাৎ মনে হলো আমিও যেন সেই নীলের মধ্যে মিশে গেলাম।

এমনি আরো কত কি।

একদিন আকস্মিকভাবেই ক্ষুদিরামবাবু দেহত্যাগ করলেন।

পিতৃহীন বালক গদাধরের একমাত্র মা ছাড়া আর কেউ রইলো না এ পৃথিবীতে।

ক্ষুদিরামের মৃত্যুতে সংসারটি নিঃসহায় হলো। তবুও চন্দ্রমণি দেবী ভেঙ্গে পড়লেন না বড় ছেলে রামকুমারের উপর ভরসা করতে হলো সংসারের।

পিতার মৃত্যুর পর গদাধর যেন শান্ত হয়ে গেলেন। প্রায় সময়ই নির্জনে বসে কাটাতে লাগলেন। যদিও কখনো বাড়ীর বাইরে যান ত পান্থশালায়।

বাড়ী থেকে কিছুদূরে পুরী যাবার পথে ছিল এক পান্থশালা। তীর্থযাত্রী আর সাধু-সন্ন্যাসীরাই এখানে বিশ্রাম করতেন। বালক গদাধর সেইসব সাধু-সন্ন্যাসীদের এটা ওটা কাজ করে দেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন। কখনো কখনো সেখানে সারাদিনই কাটিয়ে আসতেন।

সময় কাটতে থাকে। ধীরে ধীরে ক্ষুদিরামের অভাব অনেকটা গা সওয়া হয়ে গিয়েছে।

গদাধরের বয়েস এখন নয় বৎসর। বড় ভাই রামকুমার গদাধরের উপনয়নের দিন ধার্য করলেন। কিন্তু মুস্কিল হলো ভিক্ষে মা নিয়ে।

কামার কন্যা ধাত্রীমা এক সময় গদাধরকে বলেছিলেন,—বাবা, পৈতের সময় তুমি আমাকে প্রথম মা বলে, ভিক্ষে নিও। শিশু গদাধর তখন কথাটির গুরুত্ব না বুঝে কথা দিয়েছিলেন। আজ সেই কথা রামকুমারকে জানাতে আশ্চর্য হয়ে রামকুমার বললেন,— তা কেমন করে হয়। আমাদের বংশে এ রকম নিয়ম নেই।

নিয়ম নেই তা আমি কি করব। আমি যে কথা দিয়েছি। সত্যভঙ্গকারী উপবীত গ্রহণের অনুপযুক্ত। বললেন গদাধর।

অগত্যা রামকুমার সেই কথাই মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

ধন্য হলো কামার কন্যা সেই ধনী।

গ্রামের লাহাবাবুদের বাড়ীতে ধর্মসভা বসেছে। বহু বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ বসেছেন ধর্মশাস্ত্র আলোচনায়। উপস্থিত বহু লোকের মধ্যে দশ বৎসর বয়স্ক গদাধরও রয়েছেন। একমনে শুনছেন ধর্মের ব্যাখ্যা।

এমন সময় দুইজন মহাপণ্ডিতের মধ্যে একটা বিষয়ে তুমুল তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল। মীমাংসা আর হয় না। শ্রোতৃমণ্ডলী অবাক হয়ে শুনছেন দুজনের ব্যাখ্যা। সেই সময়ে কিশোর গদাধর উঠে এগিয়ে গেলেন পণ্ডিতদ্বয়ের কাছে। তাঁদের প্রণাম করে অনুমতি চাইলেন কিছু বলবার জন্যে।

আশ্চর্যের আনন্দে তাঁরা অনুমতি দিতে অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় গদাধর তাঁদের মীমাংসা শুনিয়ে দিলেন।

সকলে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন,—কে এই অসম সাহসী কিশোর? সকলেই তখন গদাধরকে প্রশংসা করতে লাগলেন।

* * *

এর কিছুদিন পর গদাধর রঘুবীরের পূজার ভার পেলেন। পূজো করতে অনুমতি পেয়ে ভীষণ খুশি গদাধর। তাঁর নিষ্ঠা সহকারে পূজো করা দেখে স্বভাবতই মনে হয় যেন জন্ম জন্ম ধরে ইনি পূজো করে আসছেন। এ অভিজ্ঞতা, এই নিষ্ঠা ত দু-এক যুগের নয়।

শিবরাত্রির দিন পাইনদের বাড়ীতে যাত্রাগান হচ্ছে। যে লোকটি শিবের পার্ট করছিল সে অসুস্থ হয়ে পড়ায় যাত্রা বন্ধ হবার উপক্রম। পাড়ার ছেলেরা এসে ধরলো গদাধরকে।

যে কোনো উপায়ে শিবের ভূমিকাটি করে না দিলে মান থাকবে না।

গদাধর রাজী হননি প্রথমটায়। গেলে পূজোয় ব্যাঘাত হবে।

কিন্তু এটাও তো শিবেরই পার্ট। শিবছাড়া শিবের পালা হবে কেমন করে?

অবশেষে রাজী হলেন গদাধর।

কিশোর গদাধর যখন শিবের সাজ পরে আসরে এসে দাঁড়ালেন, তখন দর্শকরা অবাক। যেন সত্যিকার শিব কৈলাস থেকে নেমে এসেছেন।

গদাধরেরও সারা মনপ্রাণ তখন শিবচিন্তায় বিভোর।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সমাধিস্থ হয়ে পড়েন গদাধর। যাত্রাগান অসমাপ্তভাবেই বন্ধ হয়ে গেল।

এরপর থেকে প্রায়ই এমনি করে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন।

প্রথম প্রথম অনেকের বেশ চিন্তা হয়েছিল, কিন্তু এই ঘটনা প্রায়ই যখন ঘটতে লাগলো এবং তাতে গদাধরের স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি হয় না ; তখন আর তা নিয়ে কারো চিন্তা রইলো না।

তবে ধর্মের দিকে গদাধরের আকর্ষণ ক্রমশঃ বেড়েই চললো।

বিদ্যালয়ে আর মন বসে না। কিছুদিন পর তাও বন্ধ হয়ে গেল।

এমনি অবস্থায় দুটি বছর কেটে গেল।

ইতিমধ্যে সংসারের পরিবর্তন হয়ে গেছে অনেক।

সেজ ভাই ও ছোট বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। প্রসবকালে বৌদি মারা গেলেন এবং রামকুমারের স্বাস্থ্যের অস্বাভাবিক অবনতি প্রভৃতি মিলিয়ে একটা বিপর্যয় হয়ে গেল যেন।

সেই সঙ্গে পরিবারের স্বচ্ছলতায়ও যেন ভাটা পড়লো। চারিদিকে দেনা-দায়িক রামকুমারকে বিব্রত করে তোলে। অগত্যা তিনি কলকাতায় এসে টোল খুললেন।

গদাধর সারাক্ষণই প্রায় বাড়ীতে কাটান। পুজো অর্চনাই তাঁর একমাত্র কাজ। কাজের শেষে গ্রামের মেয়েরা অনেকেই আসেন চন্দ্রমণি দেবীর কাছে। তাঁদের অনুরোধে গদাধরকে

রামায়ণ পাঠ করে শোনাতে হয়, গান গাইতে হয়। এই কাজগুলি ক্রমশঃ নিত্যকর্ম হয়ে দাঁড়ালো।

তবে প্রতিদিনই এক রকমের নয়। কোনদিন পালা গান, কোনদিন কীর্তন যাত্রা, কোনদিন বা ধর্মগ্রন্থ পাঠ।

গ্রামের সকলের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল বালকের মধ্যে ভগবানের অংশ রয়েছে। বালকবেশে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নিয়েছেন চন্দ্রমণির গর্ভে।

কিন্তু হলে কি হয় গদাধরের এই সরলভাব সকলে ঠিক খুশীমনে গ্রহণ করতে পারে না।

লাহাবাড়ীর দুর্গাবাবু গদাধরকে যথেষ্ট ভালবাসতেন, কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশাটা যেন কেমন কেমন লাগছিল তাঁর চোখে।

দুর্গাদাসবাবু বলেন—মেয়েরা যত পর্দানসীন থাকবে ততই সৎ থাকবে।

গদাধর বলেন,—তা কেন, সুশিক্ষা আর ভগবৎ বিশ্বাসই সকলকে সৎপথে টেনে আনে। ইচ্ছে করলে আমি আপনার পর্দার ভিতরে গিয়ে সুশিক্ষা দিতে পারি।

দুর্গাদাসবাবু বললেন,—বেশ, চেষ্টা করে দেখ।

সন্ধ্যাবেলা দুর্গাদাস বাইরে বসে গল্প-গুজব করছেন। এমন সময় একটি মহিলা এসে রাত্রিটুকুর জন্যে আশ্রয় চাইলো। দুর্গাদাস ভালো করে লক্ষ্য করেন গ্রামীয় সুতো বিক্রেতা মহিলাকে। তারপর নানাপ্রকার প্রশ্নাদির পর তাকে অনুমতি দিলেন অন্দরমহলে যাবার।

নিশ্চিন্তে রয়েছেন দুর্গাদাস। কিন্তু মাঝরাত্রে রামেশ্বর এলেন গদাধরের খোঁজে। বললেন, এই বাড়ীতেই আছে সে।

দুর্গাদাসবাবু অবাক। খোঁজ করে দেখা গেল সেই মহিলাই স্বয়ং গদাধর। তখন দুর্গাদাস বাবুর অহঙ্কার চূর্ণ হলো।

সেই থেকে তাঁর নিষিদ্ধ অন্তঃপুর আর নিষিদ্ধ রইলো না।

গদাধর যেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তেমনি ভেবেই গ্রামের সকলে কারণে অকারণে পরামর্শ নিতে আসে সকল কাজে। সকল জায়গায় গদাধরের অবাধ গতি। সকলের মনে গদাধরের উঁচু আসন।

গদাধরের একমাত্র চিন্তা কেমন করে তাঁর নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস ও ভক্তি ক্রমশঃ উচ্চমার্গে আরোহণ করতে থাকে।

রামকুমার বছরে একবার কলকাতা থেকে কামারপুকুরে আসেন। সেখানে তাঁর টোল বেশ চালু হয়েছে।

এবার বাড়ি ফিরে দেখলেন গদাধর লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। রামকুমার বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন।

দেখেশুনে অবশেষে গদাধরকে কলকাতার নিজের কাছে নিয়ে এলেন রামকুমার। উদ্দেশ্য, গদাধরকে নিজের কাছে রেখে মনের মত করে লেখা-পড়া শেখাবেন।

গদাধরের বয়স তখন সতেরো।

অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

সতেরো বছর পর জন্মভূমি কামারপুকুর ত্যাগ করে যৌবনের প্রারম্ভে প্রথম পদার্পণ করলেন লীলাভূমি কলকাতায়।

পিছনে পড়ে রইলো আজন্মের স্মৃতিমাখা, আবাল্য কৈশোরের লীলাভূমি কামারপুকুর।

কলকাতায় এসে রামকুমার বললেন,—তোকে এবার মন দিয়ে লেখাপড়া শিখতে হবে।

গদাধর স্পষ্ট কথায় জানিয়ে দিলেন—যা হবার তা হয়ে গেছে। তোমাদের ঐ চাল কলা বাঁধা বিত্তে আমার আর হবেনা বা শিখবার ইচ্ছেও নেই আমার।

তাহলে কি করবি? প্রশ্ন করেন রামকুমার।

আমি সেই শিক্ষা শিখতে চাই, যাতে মানুষের মনে জ্ঞানের উদয় হয়। অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ঈশ্বরের শ্রীচরণপ্রাপ্তিই আমার লক্ষ্য।

এই বয়সে গদাধরের মুখে এমন স্পষ্ট উক্তি শুনে রামকুমার যুগপত চকিত ও বিস্মিত হলেন!

* * * *

ঝামাপুকুরেও অতি অল্পদিনের মধ্যে কামারপুকুরের মত সকলের কাছে প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন গদাধর। রামকুমার অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু তাঁর ইচ্ছামত লেখাপড়ায় মন দিতে পারেন না গদাধর।

রামকুমার অবশেষে ওর আশা ছেড়ে দিয়ে বললেন,—এখন সংসার চলবে কেমন করে? এদিকে টোলের যা অবস্থা তাতে বেশিদিন আর চলবে না। উপায়টা কি হবে?

যা হোক একটা হবেই। বললেন গদাধর।

দেখতে দেখতে দুটি বছর কলকাতায় কেটে গেল। গদাধর এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ান। ঘুরে বেড়ান তাঁর অভীষ্টের খোঁজে, অনুসন্ধান করেন তাঁর সংকল্পের পথ। কিন্তু কোথাও মেলে না সে পথের নিশানা।

এই সময়ে রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে এক কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। স্বপ্ন দেখে দেবীকে ভোগ দিতে সঙ্কল্প করেছেন।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ডেকে প্রকাশ করলেন তাঁর মনোবাসনা।

সকলেই নিরাশ করলেন তাঁকে,—জগদম্বা কখনো নিচু জাতির ভোগ গ্রহণ করবেন না।

রানী রাসমণির ব্যাকুল প্রাণ কেঁদে উঠলো। তাহলে জগদম্বা ···র একমাত্র আশা ব্যর্থ করবেন?

সেই সময়ে রামকুমার বিধান দিলেন,—ব্রাহ্মণকে সম্পত্তি দান করে সেই সম্পত্তির মাধ্যমে অন্নভোগের ব্যবস্থা করলে সব দিক রক্ষা হয়। এতে পূজারীরও আপত্তি থাকতে পারে না।

অকুল পাথারে যেন ঠাঁই পেলেন রানী।

অতঃপর রামকুমার পূজারী নিযুক্ত হলেন। তখনো পর্যন্ত অন্যান্য পূজারীদের মনের সন্দেহ কাটেনি। রামকুমার জগদম্বার সেবার ভারও নিলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন গদাধরকে।

কিন্তু গদাধরের মনের মধ্যে একটা অন্যভাব রয়েছে। তিনি খুশীমনে গ্রহণ করতে পারেন না দাদার বিধান বা ক্রিয়াকলাপ। তারপর রামকুমারের কাছে ব্যাখ্যা শুনে যদিও বিধান মানলেন, কিন্তু প্রসাদ নিতে রাজী হলেন না।

গঙ্গার ধারে নিজের হাতে রান্না করে খান গদাধর। কিন্তু বেশিদিন এ অবস্থায় থাকতে হলো না। তাঁর স্বভাবসুলভ সরলতার গুণে এখানেও নিজের আসনটুকু অধিকার করতে সমর্থ হলেন।

এমন সময় ভাগনে হৃদয়রাম দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত। সমবয়সী ভাগ্নেকে পেয়ে গদাধরের একাকীত্ব ঘুচলো। তাঁর সাথীহারা জীবনে একজন উপযুক্ত সাথী পেয়ে অত্যন্ত খুশী হলেন।

হৃদয়রাম গৃহী মানুষ, স্বার্থের সচেতনতা থাকা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু গদাধরকে অত্যধিক স্নেহ করতেন।

সেদিন কি খেয়াল হলো গঙ্গার ধারে বসে একটা মাটির শিবমূর্তি তৈরী করে পূজো করলেন গদাধর।

মথুরবাবুর চোখে পড়লো সেই দৃশ্য। অবাক হলেন তিনি মূর্তিটি দেখে। পূজো হয়ে গেলে মূর্তিটা চেয়ে নিয়ে রানীকে দেখালেন। রানী রাসমণিও অবাক হয়ে গেলেন মূর্তিটির নির্মাণকৌশল দেখে।

মথুরবাবু গদাধরকে একটা কাজ দিতে চান। কিন্তু গদাধর কাজ নিতে রাজী নয়। হৃদয়কে বললেন,—মানুষের চাকরী করবো কি

গো, আমি ত ভগবানের কাছে চাকরী খুঁজছি। তা যদি পাই তো মনের আনন্দে করি।

সেই থেকে গদাধর আর মথুরবাবুর সামনে যান না। সর্বদাই মথুরবাবুর ধরা-ছোঁওয়ায় বাইরে লুকিয়ে থাকেন।

সেদিন কিন্তু পড়তেই হলো সামনা-সামনি। মথুরবাবু দূর থেকে ডেকে পাঠালেন গদাধরকে। গদাধর রাজী নয়।

হৃদয়রাম বললেন,—ডাকছেন যখন যাও না।

বলো কি ; গেলেই তো চাকরীর কথা বলবেন। বললেন গদাধর।

তা দিতেই যদি চান তো নিয়ে নাও না কেন, চাকরী বলে কথা। না বাপু, চিরকাল আটকে থাকতে পারবো না আমি। কাজ বলে কি যা তা কাজ ? দেবীর গয়না গাটি পর্যন্ত সামলাতে হবে আমাকে। তবে তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকো, তাহলে অবশ্য আমার আপত্তি নেই।

হৃদয় বললো,—বেশ থাকবো আমি তোমার সঙ্গে। তবু তুমি কাজটা নিয়ে নাও।

হৃদয় এসে খবর দিলো মথুরবাবুকে।

গদাধরের চাকরী হলো। বেশকারীর কাজ, সহকারী রইলো হৃদয়।

গদাধর চাকরীতে সম্মতি দিয়েছেন দেখে রামকুমারও আশ্বস্ত হলেন। এতদিন তাঁর যেন চিন্তার অবধি ছিল না। কেবলই মনে হতো গদাধরটা যেন অন্যরকম হয়ে না যায়।

অল্পদিনের মধ্যেই গদাধর মথুরবাবু এবং রানী রাসমণির প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। গদাধরের উপর অখণ্ড বিশ্বাস রানীর।

মথুরবাবু জানতেন গদাধরের ভাবসমাধি আর দিব্যদর্শনের কথা। প্রয়োজন হতেই ছুটে আসেন গদাধরের কাছে। গদাধরও ঠিক যেন প্রয়োজন মেটাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই থাকেন।

একদিন রাধাগোবিন্দজী মূর্তির পা ভেঙ্গে যেতে মথুরবাবু এলেন গদাধরকে ডাকতে। বললেন,—এখন উপায় কি? কর্তব্য কি আমাদের? ঠাকুরের কলেবর বদল করতে হবে না জুড়ে দিলে চলবে?

গদাধর ভাবতে ভাবতে সমাধিস্থ হলেন। অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভগ্ন হয়ে বললেন,—না, মূর্তির পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই, আমিই জোড়া লাগিয়ে দিচ্ছি ভাঙ্গা পায়ের।

সঙ্গে সঙ্গে এমন নিখুঁতভাবে ভাঙ্গা পা জোড়া দিলেন গদাধর যে বোঝা যায় না। কিন্তু অনেকের মনের খুঁত-খুঁতানি গেল না। কেউ বলে খুঁত থাকলে পূজো হয় না, কেউ বলে অমঙ্গল হয়।

রানী আর মথুরবাবু কারো কথায় কান দেন না। গদাধরের উপর তাঁদের বিশ্বাস অচল অটল।

গদাধর তাদের ডেকে বললেন,—ঠাকুরের পা ভাঙ্গবে কি গো। যিনি অখণ্ডমণ্ডলাকার, সমগ্র বিশ্ব চরাচর ব্যাপ্ত হয়ে আছেন তিনি কি কখনো ভাঙ্গা হতে পারেন? আসলে যার যার মনকে ঠিক করো। মূর্তিটা তো বস্তু। ওর অসার দিকটা না ভেবে সার দিকটা ভাবো, তাহলেই গণ্ডগোল মিটে যাবে।

সকলে আশ্বস্ত হয় সেই কথা শুনে।

রানী যখনই দক্ষিণেশ্বরে আসেন আগে তাঁর গদাধরের গান শোনা চাই। গদাধরের অপূর্ব মিষ্টি গলার সেই ভাবময় মাতৃবন্দনা যে শুনেছে একবার তার জীবন সার্থক, জীবনে ভুলতে পারবে না সে সেই সঙ্গীতের রেশটুকু।

পূজো করেন গদাধর। দুচোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে আর গদাধর পূজো করছেন। সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখে দর্শনার্থীরাও যেন চেতনা হারান।

এমন সময় খেয়াল হলো গদাধর শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নেবেন।

কেনারাম ভট্টাচার্য তাঁর ভক্তিভাব দেখে অবাক হলেন। দীক্ষা দিয়ে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন শিষ্যকে।

রামকুমারের স্বাস্থ্য এমনিতেই ভালো হচ্ছিল না। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি গুরুতর পীড়িত হয়ে পড়লেন; তখন মথুরবাবুর ইচ্ছাতেই গদাধর পূজারী নিযুক্ত হলেন। হৃদয়ের উপর ভার পড়লো রাধা-গোবিন্দজীউর।

রামকুমার আর ভালো হয়ে উঠলেন না। কিছুদিন পর তিনি দেহত্যাগ করলেন। গদাধর একরকম অভিভাবক হারা হলেন।

পিতার মৃত্যুর পর মা চন্দ্রমণি আর রামকুমারের স্নেহছায়াতলে নিশ্চিন্তে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। এবার ভ্রাতৃবিয়োগে গদাধর মনে খুব আঘাত পেলেন।

গদাধরের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠলো—জন্মিলে মরিতে হবে। পৃথিবীতে যা কিছু জন্মায় তার মৃত্যু অবধারিত। সংসার শুধু মায়ার বন্ধন।

ধীরে ধীরে সেই মায়া কাটিয়ে পূজোয় মন দিলেন গদাধর।

সকল কারণের কারণ জগদম্বার সাক্ষাতের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। দিনরাত শুধু মা, মা বলে কাঁদেন। কখনো মা, মা বলতে বলতে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। কখনো মন্দিরে এসে বসে থাকেন চুপটি করে, কখনো প্রাণখুলে গান করেন। কারো সঙ্গে কথা বলেন না।

আবার কখনো বা গভীর পঞ্চবটী তলায় গিয়ে ধ্যানে বসে রাত কাটিয়ে দেন।

মামার এমনি অবস্থা দেখে হৃদয়ের চিন্তার অবধি থাকে না। তাঁকে ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু বললেই যে গদাধর ফিরবেন না তাও জানে হৃদয়। তাই মনে মনে ফন্দি আঁটে।

গভীর রাত্রে গদাধর যখন পঞ্চবটীর তলায় ধ্যানে মগ্ন, হৃদয় তখন দূর থেকে ঢিল ছোঁড়ে। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার, গভীর জঙ্গল, তার মধ্যে ক্রমাগত ঢিল পড়তে থাকে গদাধরের আশেপাশে।

এমনিভাবে চললো কয়েকদিন। কিন্তু কিছুতেই গদাধরের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া হয়না।

তাহলে কি গদাধর জানতেই পারেন না ঢিলের কথা? মনে মনে ভাবে হৃদয়। দেখতে হবে গদাধর কি করেন।

সেদিন রাত্রে গোপনে হৃদয় চললো গদাধরের পিছনে পিছনে। কিন্তু তাঁর কাণ্ড দেখে হৃদয় যেন নিজেই ভয় পেয়ে গেল। সম্পূর্ণ উলঙ্গ আর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে ধ্যানে মগ্ন গদাধর।

চমকে উঠে হৃদয় গিয়ে ডাকতে শুরু করে,—বলি তোমার কি মাথা খারাপ হলো নাকি? এসব কি আরম্ভ করেছ?

অনেকক্ষণ পর ধ্যান ভাঙ্গলে গদাধর বললেন, ধ্যান করবার এই তো সবচেয়ে সহজ সরল নিয়ম। মায়ের কোলে উঠতে হলে যে সব বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হয়।

হৃদয়ের মুখ বন্ধ হলো, কিন্তু চিন্তা বেড়েই চলে।

পুজো নিয়ে নানাজনে নানাকথা বলে মথুরবাবুকে। দিন দিন পূজোর সময় দীর্ঘ হচ্ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পুজো করেন গদাধর। এ কেমন কথা।

মথুরবাবু হাসেন। বলেন না কিছু। রানীকে শুধু বলেন, এবার জগদম্বা মূর্ত হয়ে উঠবেন, জাগ্রত হয়েছেন দেবী গদাধরের ভক্তির গুণে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু কাঁদছেন—আর কতকাল, মাগো, আর কত দেরি। আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন গদাধর। কান্না শেষে বলেন, আর নয়, মা নেই। তবে আর এ জীবনের দাম কি আছে। এ জীবন আর রাখব না।

বলে মা জগদম্বার দিকে তাকালেন গদাধর। জগদম্বাকে তিনি মাতৃভাবে বিশ্বাস করে নির্ভরশীল। সেই মা'ই যদি দেখা না দেন তাহলে জীবন না রাখাই বাঞ্ছনীয়।

মায়ের হাতের খড়্গ লক্‌লক্‌ করছে। গদাধর হাত বাড়ালেন। মায়ের সামনে আত্মহত্যা করবেন।

সহসা অদ্ভুত একপ্রকার অনুভূতি। যেন বিদ্যুতের শিহরণ খেলে গেল সমস্ত শরীরের মধ্যে। চোখে জাগলো যেন দিব্যদৃষ্টি। পরিপূর্ণ ভাবে তাকিয়ে রইলেন মূর্তির দিকে।

গদাধর দেখলেন, মূর্তি নেই। মা সজীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সামনে। চোখে মুখে বরাভয়।

জ্ঞান হারালেন গদাধর। লুটিয়ে পড়লেন মায়ের চরণে। সেই চেতন—অচেতন অনুভূতির মধ্যে মনে হলো। এক অনন্ত জ্যোতির সমুদ্রে তিনি ধীরে ধীরে তলিয়ে গেলেন।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে আনন্দে মা মা বলে কাঁদতে লাগলেন। অনেকদিন পর শিশু তার মাকে পেয়ে যেমন আনন্দে কেঁদে ফেলে।

তারপর থেকে পুজোর কথা আর যেন মনে থাকে না। মায়ের দর্শনলাভে আত্মহারা হয়ে থাকেন। বাহ্যচেতনা হারিয়ে কথা বলেন, হাসেন, কাঁদেন।

সেভাব অন্যে বুঝতে পারে না। হৃদয়রাম একজন অন্য পূজারী দিয়ে নিয়ম রক্ষা করেন। গদাধর সজ্ঞানে থাকলে তিনিই পুজোয় বসেন।

ধীরে ধীরে কিশোর গদাধর ম্লান হয়ে গেল। জন্ম নিলেন প্রেমের ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তরা ডাকেন 'ঠাকুর' বলে।

অন্যের কথার, আর রীতিনীতির ধার ধারেন না ঠাকুর। মা'র আদেশ ছাড়া কিছুই করেন না। ছোট্ট শিশুটির মত কেঁদে বলেন,—যা করাবার তুই করিয়ে নে মা।

ভোগারতির সময়ে শরীরী মা ঠাকুরের হাত থেকে ভোগ গ্রহণ করেন। তখন হয়ত পুজো শেষ হয়নি অথচ নৈবেদ্য নিবেদন হয়ে গেল।

হৃদয় খানিকটা বুঝেছিল। মন্দিরে ঢুকলেই তার গাটা শিউরে উঠতো। অনুভব করতো অপার্থিব একটা কিছু, কিন্তু পুরোটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারতো না। তবুও মাঝে মাঝে ভাবতো, মামা পাগল হয়ে যায়নি তো?

পুজোয় নিয়মের ব্যতিক্রম যদি মথুরাবাবু বা রানী জানতে পারেন, তাহলে কি হবে এই ভাবনায় হৃদয়ের ঘুম হতো না, কিন্তু সে কথা বোঝাবেন কাকে? ঠাকুর তো একরকম মাতাল হয়েই থাকেন সর্বদা।

কখনো মাকে গান শোনাচ্ছেন, কখনো মূর্তির সঙ্গে হেসে হেসে কথা কইছেন। আবার কখনো প্রেমানন্দে নৃত্য করছেন। ভোগের থালা থেকে এক গ্রাস তুলে নিয়ে মা'র মুখের কাছে ধরে বলছেন—খা মা, খা, নইলে দেখ আমিই খাচ্ছি। বলে নিজেই খেয়ে নিলেন। আবার সেই উচ্ছিষ্ট জগদম্বার সামনে ধরে বলছেন, আমি ত খেয়েছি, এবার তুই খা।

একদিন ভোগের অন্ন একটা বিড়ালকেই খাইয়ে দিলেন।

ফুল তুলতে তুলতে কথা বলছেন এমনভাবে, যেন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে কথার উত্তর দিচ্ছে কেউ।

আবার হয়তো ঘরে এসে মা'র রূপোর খাটে শুয়ে পড়লেন।

ভয়ে ভয়ে একথা হৃদয় কাউকে বলতো না। কিন্তু ক্রমশঃ কর্মচারীদের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল সব কথা। তারা ভাবলো ভটচায্যি মশায়ের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। দেবীর পুজোয় ব্যাঘাত হচ্ছে ভেবে তারা খবর দিল মথুরবাবুকে।

মথুরবাবু আশ্বাস দিলেন ব্যবস্থা করবার। সকলে ভাবলো এবার আর ভটচায্যি মশায়ের চাকরী থাকবে না।

নিজের চোখে না দেখে মথুরবাবু কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন না। তাই একদিন হঠাৎ পূজোর নির্দ্দিষ্ট সময়ে এসে উপস্থিত হলেন তিনি।

ঠাকুরের সেদিকে খেয়াল নেই। তন্ময় হয়ে আছেন মা'র সামনে। যেন বাহ্যজ্ঞান নেই।

মথুরবাবু যেন মন্দিরে জগদম্বার উপস্থিতি অনুভব করলেন। ভক্তিতে সারা দেহ রোমাঞ্চিত হ'ল। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন তিনি জগৎমাতার চরণে। তারপর যেমন নীরবে এসেছিলেন, তেমনি নীরবে চলে গেলেন সেখান থেকে।

পরদিন নির্দেশ এলো—ভটচায্যিমশায় যেমন খুশী পূজো করবেন, তাঁর কাজে যেন ব্যাঘাত না হয়।

ঠাকুর বললেন—ঈশ্বরকে পেলেই হয় না। তাঁকে ধারণ করবার মত সহ্যশক্তি থাকা চাই।

ঠাকুরের নিজের বেলাতেও তাই হয়েছিল।

প্রথম মাস ছয়েক ভীষণ কষ্টের মধ্যে দিন কেটেছে। সমস্ত শরীর যেন অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বালা করতো। যেন পুড়ে যেতে চাইতো এমনি করে ধীরে ধীরে তিল তিল করে অশুদ্ধভাব অন্তর্দ্বন্দে পরাজিত হয়ে শরীর ত্যাগ করলে তবে মুক্ত হওয়া যায়, ধারণক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শরীরকে অভ্যস্ত করতে হয়, নইলে নিষ্কৃতি নেই।

ভাবের ঠাকুর তন্ময় হয়ে পূজো করেন। মথুরাবাবুও তন্ময় হয়ে আছেন। হঠাৎ ঠাকুর এসে মথুরবাবুর হাত ধরে বললেন,—আজ

থেকে হৃদয় পুজো করবে। মা বলেছেন হৃদয়ের পুজোও তিনি আমার মত গ্রহণ করবেন।

রাজী হলেন মথুরবাবু। বেশ তাই হবে।

প্রথম থেকেই ঠাকুরের উপর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন মথুরবাবু। অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি। এখন সেই ভক্তিশ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। সর্বদাই তিনি ঠাকুরের সুখ সুবিধার জন্য খোঁজ খবর নিতেন।

এতদিন পুজোর কাজ হৃদয়রাম চালিয়ে যাচ্ছিল। কিছুদিন পর ঠাকুরের খুড়তুতো ভাই রামতারক দক্ষিণেশ্বরে আসতে তাঁর উপর পড়লো পুজোর ভার।

রামতারকও ছিলেন গভীর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। ঠাকুর ডাকতেন তাঁকে হলধারী বলে। তিনি নিজের হাতেই রান্না করে খেতেন।

একদিন মথুরবাবু বললেন, তোমার ভাই আর ভাগ্নে তো ঠাকুর-বাড়িতে প্রসাদ গ্রহণ করে, তুমিও করোনা কেন?

রামতারক বললেন, আমার ভাইয়ের কোনো কিছুতেই দোষ হয় না। ওর এখন উচ্চাবস্থা। আমার দোষ হবে।

মথুরবাবু আর কিছু বলেন না।

ঠাকুরের ঈশ্বর দর্শনের আকাঙ্খা সার্থক হয়েছে। কিন্তু শুধু নিজের জন্য করলেই তো হলো না। জগতের মুক্তির কথাও ভাবতে হবে। মুক্ত করতে হবে তাঁর সকলকে। ঠাকুরের পথে ঈশ্বর-প্রাপ্তি সকলের পক্ষ সম্ভব নয়। সাধারণের জন্য তৈরি করতে হবে সাধনার পথ। অতএব এখন থেকে সাধনার পথে অগ্রসর হতে হবে তাঁকে। আয়ত্ব রাখতে হবে সবকিছু তাঁর ভবিষ্যতের জন্য।

ধ্যানের জন্যে পঞ্চবটী স্থাপন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

অশ্বত্থ, বেল, বট, অশোক আর আমলকি! এই নিয়ে পঞ্চবটী। সেই পঞ্চবটীতে বসে চোখ বুজে ধ্যান করছেন। ধ্যাননেত্রে দেখলেন

জ্যোতির্ময়ী এক রমণী এসে দাঁড়ালো তাঁর সামনে। অঙ্গে অঙ্গে তাঁর প্রেম করুণা আর সহিষ্ণুতার ছাপ। সেই মুহূর্তে কোথা থেকে যেন একটা হনুমান এঁসে রমণীর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লো।

সীতাকে চিনতে এবার আর অসুবিধা হল না শ্রীরামকৃষ্ণের। তিনি মা মা বলে যেমনি তাঁর পায়ে পড়তে যাবেন, অমনি দেবী তাঁর শরীরের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

এমনিভাবে আরো উচ্চমার্গে উঠতে থাকেন ঠাকুর।

এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে নানাপ্রকার সাধু সন্ন্যাসীদের যাতায়াত ছিল। ঠাকুর তাঁদের কাছে হঠযোগের কথা শুনে শুনে নিজেও অভ্যাস করতে লাগলেন।

লোকে বলে রামতারক বাকসিদ্ধ পুরুষ। ঠাকুরের কানে গেল সে কথা। তিনি একদিন রামতারককে ডেকে বলেন,—নানাজনে নানাকথা বলছে তোমার সম্বন্ধে।

রামতারক ভাবলেন ঠাকুর বুঝি তাকে ঠাট্টা করছেন। তাই রেগে গিয়ে তিনি ঠাকুরকে অভিশাপ দিলেন। তোর ঐ মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে।

সত্যি সত্যি একদিন রাত্রে ঠাকুরের মুখ দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগলো। রক্ত আর বন্ধ হতে চায় না। খবর গেল রামতারকের কাছে।

রামতারক ছুটে এসে দেখেন ঠাকুরের অবস্থা। অনুশোচনায় তিনিও কাঁদতে লাগলেন।

এমন সময় এক সাধু এলেন সেখানে। তিনি বললেন, ভালই হয়েছে। এসব সেই যোগ সাধনের ফল। মা জগদম্বা এবার তাঁর দরকারে তোমাকে রক্ষা করলেন।

ঠাকুরের যেন শাপে বর হলো।

সেদিন রামতারক দেখলেন, ঠাকুর একটা গাছের উপর উঠে

দিগম্বর হয়ে এ ডাল ও ডাল ঘুরে বেড়াচ্ছেন। খানিকক্ষণ পরে ডালে বসেই প্রস্রাব করলেন ছোট ছেলের মতো। তারপর আবার ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন।

রামতারক ভাবলেন ঠাকুরকে ব্রহ্মদৈত্য ভর করেছে।

ঠাকুরের সম্বন্ধে নানা সন্দেহ উঁকি মারে রামতারকের মনের মধ্যে। এতদিন যাবত অতিমানবীয় ক্ষমতাসম্পন্ন বলে ঠাকুরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। ভগবানের অবতার বলে ভাবতেন। এমনিতেও দুই ভাইয়ের মধ্যে ছিল একটা মধুর সম্পর্ক।

কিন্তু এ ব্যাপারের পর আর তাঁকে অবতার বলা যায় না। আজ সত্যিই পাগল বলে মনে হলো ঠাকুরকে।

রামতারকের শিশুপুত্রটি এই সময় মারা গেল।

মনের কষ্টে মা কালীকে বললেন—তমোগুণময়ী।

ঠাকুর ছিলেন ভাবাবিষ্ট ; চেপে ধরলেন রামতারককে। বললেন, —তার চেয়ে বলো 'মা ত্রিগুণময়ী'।

ঠাকুরের স্পর্শে ভীষণভাবে চমকে উঠলেন রামতারক। যেন তড়িতাহত হলেন। তখন ভুল ভাঙ্গলো তাঁর।

হৃদয় চাইলো রামতারকের মুখের দিকে। তখন হৃদয়কে বললেন —কি জানি ওর কাছে গেলেই আমার অমনি হয়।

এমনি করে সাতটি বছর কাটালেন রামতারক। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণকে সমস্ত অন্তর দিয়ে যে কোন একটা বলে ভাবতে পারেন নি। কখনো ভাবছেন ঠাকুর পাগল, আবার কখনো ভাবছেন ঠাকুর সত্যিই বুঝি সিদ্ধপুরুষ।

প্রায়ই সন্দেহের দোলায় দুলতেন ভাইটির জন্যে। কেমন যেন একটা দ্বিধাভাব।

কাঙালীভোজন হচ্ছে। ঠাকুর অমনি গিয়ে তাদের সকড়ি খেয়ে

বললেন,—অতিথিই ত নারায়ণ। আজ নারায়ণের প্রসাদ পেলাম।

তাই দেখে ভীষণ বিরক্ত হলেন হলধর—অর্থাৎ রামতারক?

হলধর বললেন,—তোর আর যদি বাদ বিচার নেই। দেখি তোর ছেলেমেয়ের বিয়ে হয় কেমন করে।

সেই কথা শুনে ঠাকুরও বললেন,—তবেরে শালা, তুই না বড্ড শাস্ত্রজ্ঞানী? তবে যে শাস্ত্রের ব্যাখ্যার সময়ে বলিস সর্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি দিতে? ধিক তোর শাস্ত্রজ্ঞানে।

রামকৃষ্ণের অগাধ ভক্তি আর অসীম ধৈর্যের কাছে শেষ অবধি নতি স্বীকার করতে হলো হলধরকে।

নিজের দেহে রামকৃষ্ণ গুরুর প্রকাশ দর্শন করলেন।

ধ্যান করতে করতে তাঁর শরীর থেকে এক সন্ন্যাসী বেরিয়ে এলো সামনে। হাতের ত্রিশূল দেখিয়ে বললো—দেখ, সব চিন্তা ছেড়ে দিয়ে যদি ইষ্টচিন্তা না করেছিস তাহলে তোকে এই ত্রিশূলে বসিয়ে দেব।

কিছুক্ষণ পরেই আর এক পুরুষ বেরিয়ে এলো শরীর থেকে। এই পুরুষটিকে কামময় মনে হলো ঠাকুরের। ত্রিশূলধারী সেই মুহূর্তে পুরুষটিকে ত্রিশূল দিয়ে হত্যা করে আবার ঠাকুরের দেহে মিলিয়ে গেলেন।

এমনি অনেকবার দর্শন দিয়েছেন সন্ন্যাসী।

যেন নিজের সামনে আয়নাতে সবকিছু দেখছেন তিনি।

সেবার পাল্কীতে চেপে ঠাকুর চলেছেন কামারপুকুর থেকে সিহড়; হৃদয়ের বাড়িতে। পথের মধ্যে দেখলেন সুন্দর দুটি শিশু ঠাকুরের দেহের ভিতর থেকে বেরিয়ে পথের পাশ থেকে ফুল তুলতে লাগলো। পাল্কির সঙ্গে সঙ্গে তারা চললো নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে, হাসতে হাসতে।

এমনি বহুক্ষণ চলবার পর তারা আবার ঠাকুরের দেহে এসে মিলিয়ে গেল।

দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসবার অনেকদিন পর ভৈরবী বললেন,—ওরা দুজন নিত্যানন্দ আর শ্রীচৈতন্য। একই আধারে বাস করেন দুজন।

সত্য যুগের রাম আর দ্বাপরের কৃষ্ণ এবার শরীরী হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন মানব কল্যাণের জন্যে।

অন্ধরা তাঁর ভাবাবস্থাকে ভাবতো রোগ বা পাগল অবস্থা। আর যে সব মহাসাধু আর সিদ্ধ পুরুষেরা আসতেন কালী বাড়ী, তাঁরা বলেন, ইনি মহাপুরুষ। অনেক উচ্চমার্গে স্থান এই পরমপুরুষের।

ঠাকুর একহাতে মাটি, আর একহাতে টাকা নিয়ে পরীক্ষা করছেন।

বার বার উচ্চারণ করছেন, টাকা মাটি—মাটি টাকা।

এমনি করতে করতে টাকার অসারত্ব অনুভব করলেন ঠাকুর। অনুভব করলেন মাটির গুণ। তখুনি টাকা ছুঁড়ে ফেললেন গঙ্গার জলে।

এমনি করে কাঞ্চনের লোভ সংবরণ করলেন ঠাকুর।

ঠাকুর বলেন, অহঙ্কার আর অভিমান মানুষকে নিম্নপথগামী করে। মায়াতে আবদ্ধ করে রাখে। এই দুটোর হাত থেকে আগে উদ্ধার পাও, তারপর চেষ্টা করো তাড়াতাড়ি কাজ হবে।

মথুরবাবু আর রানী রাসমণির কাছে নিত্য নতুন সংবাদ যেতে দেরি হয়না। অবশেষে তাঁরাও ভাবলেন ঠাকুরের বোধ হয় মাথায় দোষ হয়েছে।

সকলে বলে ব্রহ্মচর্যের জন্য এমনি হয়েছে। সহ্য হয়নি তাই।

মথুরবাবু জনকয়েক বারাঙ্গনা পাঠিয়ে দিলেন ঠাকুরের কাছে। যদি প্রলোভন জাগে ঠাকুরের মনে এই উদ্দেশ্যে।

কিন্তু ঠাকুর তাদের মধ্যে শক্তি স্বরূপিনী জগৎমাতার দর্শন করলেন। অমনি মা মাঁ বলে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন।

প্রণাম করে ক্ষমা চেয়ে চলে গেল বারাঙ্গনার দল।

এদিকে কামারপুকুরে ঠাকুরের সম্বন্ধে নানাকথা রটনা হতে থাকে। চন্দ্রমণির কানেও যায় সে সব কথা। তিনি উতলা হয়ে পড়েন ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

কয়েকদিন পর ঠাকুর এলেন কামারপুকুরে।

চন্দ্রমণি এবার ছেলের লক্ষণ দেখে নিঃসন্দেহ হলেন, নিশ্চয় অপদেবতা ভর করেছে। ইদানীং প্রায়ই সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হন ঠাকুর। সংসার সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। দিনরাত শুধু এক চিন্তা। কেমন করে মাতৃপদ পাওয়া যায়।

লাজ লজ্জা বলে কোনো কিছু নেই। সময়ে অসময়ে শ্মশানে ঘাটে ঘুরে বেড়ানো। শেয়াল ধরে মিষ্টি খাওয়ানো প্রভৃতি নানারকম খবর আসতে থাকে চন্দ্রমণির কাছে।

কোনদিন হয়তো সারাদিন বাড়ীতেই ফিরলেন না।

রাত্রে হয়তো রামেশ্বর খুঁজতে বেরিয়ে দেখলেন অশ্বত্থ গাছের নিচে ধ্যানমগ্ন হয়ে রয়েছেন ঠাকুর। ডাকাডাকির পর যদিও সাড়া পাওয়া গেল, তখন আবার মা মা বলে কাঁদতে শুরু করলেন।

এমনি করে দিন কাটে কামারপুকুরে। বারংবার মাতৃদর্শন পেয়েও যেন তৃপ্তি হয়না। তাই আবার দেখা পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

তবে প্রথম প্রথম যেমন এসেছিলেন, মাসখানেক পর সেই অবস্থায় অনেকটা উন্নতি হলো। আকুল ভাবটা একটু যেন কমেছে।

কিন্তু সংসারে মন বসাতে না পারলে পরিবারের সকলে শান্তি পান না। সবচেয়ে বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছেন চন্দ্রমণি দেবী।

সকলে গোপনে পরামর্শ দেন—গদাধরের বিয়ে দাও। ঘরে বৌ এলে দেখো সংসারে ঠিক মন বসবে।

অতঃপর গোপনে গোপনে বিয়ের ব্যবস্থা হতে থাকে।

গোপনে চেষ্টা চললেও যাঁর বিয়ে হবে তাঁর কাছে গোপন থাকে না কিছুই। তিনি সব জেনে ফেলেছেন। মনে মনে হাসেন ঠাকুর, কিছু বলেন না কাউকে।

গ্রামের পর গ্রাম তোলপাড় হচ্ছে কিন্তু মনের মত পাত্রী মেলে না। চন্দ্রমণি আর রামেশ্বর চিন্তায় পড়লেন। তবে কি গদাধরের বিয়ে হবে না? ওর কপালে কি সংসার ধর্ম নেই?

ঠাকুর এতদিন চুপ করে দেখছিলেন সব। এবার মা আর দাদার কষ্ট দেখে আর সহ্য করতে পারেন না। মাকে ডেকে বললেন,—তোমরা মিছেই ঘুরে মরছো, আমার পাত্রী জয়রামবাটিতে কুটো বাঁধা হয়ে আছে।

অবাক হলেন চন্দ্রমণি। বলিস কি?

হ্যাঁ, পাত্রী ঠিক হয়ে আছে আমার। জয়রাম মুখুজ্যের মেয়ে।

চাষীরা যেমন খেতের প্রথম ফসলটির গায়ে কুটো বেঁধে রাখে দেবতার উদ্দেশ্যে। লক্ষ টাকা পেলেও সেটা বেচবে না। সেটা লাগবে দেবতার ভোগে। তেমনি কুটো বাঁধা হয়ে আছেন সারদামণি।

সে আজ থেকে বছর চারেক আগেকার একদিনের ঘটনা।

জয়রামবাটিতে পালাগানের আসর বসেছে। আশেপাশের গ্রাম থেকেও লোক এসেছে অনেক।

জয়রাম মুখুজ্যের স্ত্রী শ্যামাসুন্দরী তাঁর কচি মেয়েটাকে কোলে করে এসেছেন গান শুনতে।

আসরের একদিকে মেয়েদের বসার জন্য আলাদা জায়গার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অপর পাশে ছেলেরা বসেছে।

সেই ছেলের দলের মধ্যে কামারপুকুর থেকে গদাধরও এসেছে তার ভাগ্নে হৃদয়কে নিয়ে গান শুনতে।

শ্যামাসুন্দরীর পাশ থেকে গ্রামেরই একজন মহিলা ঠাট্টা করে সারদামণিকে বললেন, বিয়ে করবি ?

কচি মেয়েটি নির্বিকারভাবে মিষ্টি হাসি হাসতে হাসতে জবাব দিল,—হ্যাঁ!

কাকে বিয়ে করবি ? বললেন সেই মহিলা। ছোট্ট মেয়েটির সহজ সরল ভাবকে বড্ড ভালো লাগে তার। তাই এই প্রশ্ন।

সারদামণি অপর পাশে ছেলেদের দলে বসে থাকা গদাধরের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল,—ওই যে ওকে।

তারপর শুরু হলো গান। সকলের মন তখন গানের দিকে।

সে আজ থেকে চার বছর আগেকার কথা। তবে কি সেই মেয়েটিই কুটো বাঁধা হয়ে আছে গদাধরের জন্যে ?

খবর পেয়ে লোক ছুটলো পাত্রী দেখতে। পাত্রী দেখাও হলো। কিন্তু একেবারে শিশু। সবে ছয় বছরে পা দিয়েছে। গদাধরের তেইশ।

সবদিক বিবেচনা করে চন্দ্রমণি রাজী হলেন। ওই মেয়েকেই আনতে হবে পুত্রবধূ করে।

তারপর শুভক্ষণ দেখে তিনশ্ টাকা পণ দিয়ে চন্দ্রমণি দেবী ছেলের বিয়ে দিলেন ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসে।

গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের বাড়ি থেকে খানকয়েক গয়না ধার করে এনে বৌ ঘরে তুলেছেন চন্দ্রমণি। দিনকয়েক যাবার পরেই গয়না ফেরৎ দেবার কথা মনে পড়তেই চন্দ্রমণির বুকের ভেতরটা যেন বেদনায় ফেটে যেতে থাকে। এমন সুন্দর কচি মেয়েটার গা থেকে গয়না কোনপ্রাণে খুলে নেবেন তিনি।

ঠাকুর মা'র মনের ব্যথা জানতে পেরে বিপদে পরিত্রাণ করলেন।

ঘুমন্ত সারদার গা থেকে গয়না খুলে এনে মা'র হাতে দিলেন ফেরৎ দেবার জন্যে।

সকালে ঘুম ভেঙ্গে গায়ে গয়না নেই দেখে সারদা কেঁদে ফেললেন।

চন্দ্রমণিরও চোখের জলে বুক ভেসে যায়। সারদাকে কোলের মধ্যে টেনে এনে আদর করে বললেন,—কেঁদনা মা। গদাধর তোমাকে ওর চেয়েও ভালো গয়না এনে দেবে। ওগুলো মোটেই ভাল ছিল না।

সারদামণি আর কথা বলেননি। জীবনে কোনদিনও সে কথা একটিবারও মনে হয়নি তাঁর। কিন্তু এখানেই সব কিছুর শেষ হয়নি। আভরনহীন ভাইঝিকে দেখে ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন সারদার কাকা। রাগ করে ভাইঝিকে তুলে নিয়ে গেলেন জয়রামবাটি।

ঠাকুরের কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। ক্রমে ক্রমে দেড় বছর কাটালেন কামারপুকুরে। ঠাকুর আর থাকতে চান না। চন্দ্রমণিও ছাড়বেন না।

অবশেষে ঠাকুর ফিরে এলেন কলকাতায়।

কলকাতায় এসেই আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে গেলেন তিনি। এতদিন গ্রাম্য পরিবেশে, সাংসারিক পরিবেশে যা ভুলে ছিলেন এবার আবার প্রকাশ হয়ে পড়লো। আবার তন্ময় হয়ে গেলেন ভাবের উর্ধলোকে।

দিনরাত জপ-তপ ধ্যান শুরু হলো আবার। সকল কিছুর মধ্যে জগন্মাতার দর্শনের আকাঙ্ক্ষা তাঁর সমস্ত চিত্ত জুড়ে বসলো।

হৃদয় এদিকে মথুরবাবুর কাছ থেকে কবিরাজী ওষুধ খেয়ে কোনো ফল হয় না অবশেষে কবিরাজ বললেন, এ রোগ দেহের নয়, মনের। অর্থাৎ যোগক্রিয়ার ফল, এ ওষুধে সারবার রোগ নয়।

কামারপুকুরেও গেল সে খবর। বিচলিত চন্দ্রমণি বুড়ো শিবতলায় হত্যে দিলেন ছেলের মঙ্গলকামনায়।

স্বপ্ন দেখলেন চন্দ্রমণি। বাঘছাল পরা, জটাজুটধারী স্বর্ণবরণ

বিরাট এক পুরুষ তাঁর সামনে এসে বললেন,—তোমার ছেলের জন্যে চিন্তা করোনা। সে পাগল হয়নি। ঈশ্বরাবেশে এমনি হয়েছে তার অবস্থা। ঘরে ফিরে যাও নিশ্চিন্তে।

অগত্যা চন্দ্রমণি ঘরে ফিরে এলেন। এবার তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছে। আর তিনি লোকের কথায় কান দেন না।

দীর্ঘ ছয় বৎসর এক পলক ঘুমোননি ঠাকুর। শরীর সম্বন্ধে যেন কোনো জ্ঞানই নেই।

মথুরবাবু ভাবতেন এটা অনিদ্রারোগ। কিন্তু তিনিও দর্শন পেলেন ঠাকুরের মধ্যে স্বয়ং শিব আর কালীর। ধন্য হলো মথুরবাবুর জীবন। সেই থেকে ভগবান জ্ঞানে শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন ঠাকুরকে।

১২৬৭ সালে রানী রাসমণি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কোনোপ্রকারেই তাঁকে সুস্থ করা গেল না। কিছুদিন পর তিনি দেহরক্ষা করলেন।

রানীর অবর্তমানে কালীবাড়ীর সকল দায়িত্ব এসে পড়লো মথুরবাবুর উপর। তিনি রীতিমত পারদর্শিতার সঙ্গেই সেই দায়িত্ব পালন করেছেন।

একদিনের জন্যে এতটুকু ত্রুটি হতে দেননি কোথাও।

এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পূজো করতেন না, কিন্তু নিজের হাতে বাগান থেকে ফুল তুলে মা কালীকে সাজাতেন। হয় গঙ্গার ঘাটে নয় পঞ্চবটীতলায় থাকেন বেশির ভাগ সময়।

সেদিন ঠাকুর ফুল তুলছেল। এমন সময়ে বকুলতলার ঘাটে একটা নৌকা এসে থামলো। ঠাকুর ফিরে দেখে অবাক হলেন। নৌকা থেকে ভৈরববেশী একজন স্ত্রীলোক নেমে এলো।

অসম্ভব লম্বা বিশাল এলোচুলের রাশি পিঠে ছড়ানো, পরনে গেরুয়া শাড়ী, সারা শরীরে যৌবন উচ্ছলিত। বয়স প্রায় চল্লিশ হবে কিন্তু অপরূপ তার রূপ।

ভৈরবীকে দেখে ঠাকুর কেমন যেন চিন্তায় পড়লেন। চেনা-চেনা লাগছে তাকে, অথচ নতুন। ঘরে ফিরে ডেকে পাঠালেন ভৈরবীকে। হৃদয় বলে উঠলো – চেনেনা শোনেনা ডাকলেই কি আর আসবে ?

মৃদু হেসে বললেন ঠাকুর—তুই গিয়ে আমার নাম বল, দেখবি ঠিক চলে আসবে।

হৃদয় ভাবে মামার এ কি হলো আবার। মতিগতি আবার উল্টো-পথে ধায় নাকি। দেখাই যাক কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

হৃদয় গিয়ে দেখে ভৈরবী বসে আছে চুপটি করে। কাছে গিয়ে ঠাকুরের কথামত বললো সব কথা। ভৈরবী আর প্রশ্ন না করে যেন চুম্বকের আকর্ষণে এগিয়ে এলো।

হৃদয়ের বিস্ময়ের মাত্রা উত্তোরত্তর বাড়তে থাকে।

ভৈরবী ঘরে ঢুকে ঠাকুরকে দেখেই আনন্দে চীৎকার করে ওঠেন, আরে তুমি এখানেই রয়েছো ? আমি শুনলাম গঙ্গার তীরে আছো, তাই অনেকদিন থেকে তোমাকে খুঁজছি। বাব্বা ! এতদিনে দেখা পেলাম।

আমার কথা কেমন করে জানতে পারলে মা ! বললেন ঠাকুর।

তোমাদের তিনজনের সঙ্গে আমার দেখা করবার কথা। দুজনের দেখা পেয়েছি পূবদেশে। এবার তৃতীয় জন তোমাকে পেলাম। মা জগদম্বার অনুগ্রহেই এসব জানা যায়।

তারপর শুরু হলো দুজনের কথা, যেন ফুরায় না। হৃদয় সব দেখে শুনে থ হয়ে গেল।

ভৈরবীকে ঠাকুর বললেন তাঁর সব কথা। যেমন যেমন অনুভব হয়েছে সব। আবার বলেন,—হ্যাঁ মা, আমার কি আর হবে কিছু ? লোক ত পাগল ছাড়া আর কিছু বলে না।

গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন ভৈরবী,—তাতো বলবেই। পাগলের বোঝে কি তারা ? যার যেমন জ্ঞান তেমনি তো বলবে। তোমার

এই ভাবকে বলে মহাভাব। সাধারণ মানুষ কেমন করে বুঝবে? এমনি ভাবই হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের, শ্রীরাধারাণীর।

সেদিন ভৈরবী থেকে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। তার পরেও কেটে গেল আরো দিন সাতেক। একদিন দুজনের মধ্যে শুধু কথা আর কথা। সব কথাই ঈশ্বরতত্ব। প্রশ্ন আর উত্তর। অজানাকে জানা অমীমাংসার সমাধান। ভৈরবীর ভাণ্ডার উজাড় করে গ্রহণ করেন ঠাকুর।

ঠাকুরের সামনে দ্বিধাহীন আলোকসম্পাত করেন ভৈরবী। মহা-মানবের সব লক্ষণগুলি মিলিয়ে দেখান। সংশয় মুক্ত করেন ঠাকুরকে।

দিন সাতেক পর ভৈরবী কালীবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে বাস করতে থাকলেন। কিন্তু রোজই একবার ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসতেন অবশ্যই।

প্রথম আলাপেই ভৈরবী বুঝে নিয়েছেন ইনি সামান্য সাধক নন। ঈশ্বরের ঘনীভূত শরীর রূপ। পূর্ণ প্রকাশ। মানব কল্যাণের জন্যেই অবতীর্ণ হয়েছেন যুগমুহূর্তে।

মথুরবাবুর পাশে বসে আছে হৃদয়। অপর পাশে শ্রীরামকৃষ্ণ আর ভৈরবী। নানাপ্রকার আলোচনা চলছিল।

মথুরবাবুর প্রশ্নের উত্তরে ভৈরবী বললেন,—নিত্যানন্দের খোলে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। প্রকৃত অবতারের সব লক্ষণগুলিই আমি প্রত্যক্ষ করেছি ঠাকুরের দেহে।

কিন্তু অবতার তো দশটি। বললেন মথুরবাবু, তাহলে ইনি কেমন করে অবতার হবেন?

ঠাকুর গিয়ে ভৈরবীকে বললেন,—মথুরবাবু বলছেন অবতার ত দশটি।

প্রতিবাদ করে ভৈরবী বললেন,—শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের চব্বিশটি অবতারের কথা স্বয়ং ব্যাসদেব বলে গেছেন। তাছাড়া শুধু অবতার কেন স্বয়ং নারায়ণ বহুবার সশরীরে আবির্ভাব হবেন এ নির্দেশও তো রয়েছে।

ভৈরবীর যুক্তি শুনে মথুরবাবু অতঃপর চুপ করলেন।

এই কথা কানে কানে ছড়িয়ে পড়লো শত-সহস্রকানে। তারা স্বীকার করতে রাজী নয়। অনেকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো মথুরবাবুকে একটা সভা ডাকতে। তাতে উপস্থিত থাকবেন বড় বড় পণ্ডিতরা।

অগত্যা মথুরবাবুকে সভা ডাকতে হলো। সভায় নিমন্ত্রিত হলেন অনেক মহা মহা পণ্ডিত। শুরু হলো তর্ক। ঠাকুর তবে কি? সকলের মুখে একই প্রশ্ন।

সেই বিরাট সভায় দাড়িয়ে ভৈরবী নিজ যুক্তি দিয়ে সকলের সামনে প্রমাণ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার।

ঠাকুর কিন্তু নিজের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। যে যা বলে বলুকগে, তাঁর কাজ তিনি করে চলেছেন সমানে। তাতে কোথাও ছেদ পড়েনি।

জগন্মাতার আদেশ পেয়ে তন্ত্রসাধনা শুরু করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

ভৈরবী গুরু আর রামকৃষ্ণ শিষ্য।

ভৈরবী তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধ-পরিকর। ঠাকুরও তাঁর একনিষ্ঠ সাধনায় মগ্ন হয়ে গেলেন। বাইরের কোনো কিছুই ধার ধারেন না।

পঞ্চবটীতে দুটি আসন তৈরী করে তাতে নরকঙ্কাল স্থাপন করে সাধনা শুরু হয়েছে।

ধ্যান করতে করতে মাকালীর সাক্ষাৎ হলো। মা বললেন, ভৈরবীকে দেবীজ্ঞানে পূজো করো আর ওর কোলে বসে সাধনা করো।

প্রথমে লজ্জা হলো ঠাকুরের। কিন্তু পরক্ষণেই মনকে শক্ত করে ভৈরবীর কোলে বসে পড়লেন। তারপর মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

একটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। কিন্তু এমনি আরো রয়েছে।

ভৈরবী গলিত মাংস তুলে ধরলেন মুখের সামনে। বললেন, খাও।

ঘৃণায় সমস্ত শরীর গুলিয়ে উঠলো ঠাকুরের। কেমন করে ওটা স্পর্শ করবেন জীভে?

ভৈরবী বললেন,—এই ঘৃণা জয় করতে হবে। এই দেখ আমি খাচ্ছি। বলে ভৈরবী খেতে লাগলেন। তখন ঠাকুর জ্ঞান হারালেন জগদম্বাজ্ঞানে। সেই ফাঁকে ভৈরবী ঠাকুরের মুখে তুলে দিলেন গলিত শব'এর মাংস।

ঠাকুর দিব্যি খেয়ে নিলেন তখন।

আনন্দাসনে সিদ্ধ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ভৈরবী প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন তাঁকে। রমনীমাত্রে মাতৃভাব তার কারণ নাম শ্রবণে জগৎ-কারণের উপলব্ধি ইতিপূর্বে আর কোনো তান্ত্রিকের বেলায় শোনা যায়নি।

কিন্তু এতবড় সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে ঠাকুরের লেগেছে মাত্র তিনদিন।

অথচ পরবর্তীকালে সেই ঠাকুরই বলেছেন নরেনের সম্বন্ধে, —নরেনের যা মনের জোর ছিল নির্বিকল্প সমাধিতে, তার সিকিভাগেরও একভাগ আমার ছিলনা। একমাত্র গুরুপদ সার করেই চিণ্ময়ীকে ধরে ফেলল নরেন।

ঠাকুর ক্রমশঃ নানা অপার্থিব শক্তি অনুভব করতে থাকেন। পশু-পাখীর ডাক শুনে বুঝতে পারতেন তারা কি বলছে।

ঠাকুরের তন্ত্রসাধন শেষ হলো। এখন তিনি সম্পূর্ণ বাল্যভাবে উপনীত হয়েছেন। শরীরে আবরণ রাখতে পারতেন না। আপনা আপনি খুলে পড়ে যেত এমন কি পৈতে পর্যন্ত রাখতে পারতেন না শরীরে।

সকল কিছুতেই ব্রহ্মদর্শন। তুলসীপাতা আর সজনে পাতায় সমভাব।

ঠাকুরের তন্ত্রসাধনের মূল ভৈরবী* ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরীকে যোগমায়ার অংশ সম্ভূতা বলে বিধান দিলেন ঠাকুর।

মথুরবাবুকে ডেকে বললেন,—আমার মনে হচ্ছে ভবিষ্যতে অনেক মানুষ এসে আমার শরণাগত হবে আর ধর্মলাভ করে উদ্ধার হবে।

মথুরবাবু বললেন, সে তো ভালো কথা। আমরা সকলে তোমাকে ঘিরে আনন্দ উৎসবে জীবন কাটিয়ে দেব।

*   *   *

সাধনার ক্ষেত্রে কোন পথটিই আর বাকী রাখলেন না ঠাকুর। কোনো একটি মার্গে সাধনার ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি অনুভব রাখতেন যত পথই হোক না কেন সকল পথই সেই ঈশ্বরের কাছে মিলিত হয়েছে।

তাই প্রত্যেকটি পথেই সিদ্ধিলাভ করে তিনি প্রমাণ করেছেন সেই সারসত্য। তন্ত্রসাধন শেষ হলে বৈষ্ণব মতে সিদ্ধিলাভ করলেন। ইতিমধ্যেই আবার মনে মনে সখী ভাব উদয় হয়েছে।

সেটাও সিদ্ধ হলো।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের একটি শিশুমূর্তি সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এলেন জটাধারী সাধু। প্রথম দর্শনেই ঠাকুর বুঝলেন ইনি ঈশ্বরানুরাগী ও বিরাট সেবক। জটাধারী পূজো করেন আর রামকৃষ্ণ তাঁর পাশে বসে পূজো দেখেন। দেখেন জটাধারীকে। ক্রমশঃ জটাধারীর অখণ্ড ভক্তিদর্শনে আকৃষ্ট হলেন শ্রীরামচন্দ্রের দিকে।

শিশু রামচন্দ্রকে দেখে সন্তানের উপর মায়ের যে স্নেহভাব জাগে সেই ভাব জেগে উঠলো ঠাকুরের মনে। মাতৃস্নেহে দেবশিশুর

সেবা করতে লাগলেন। ঠাকুরের আকুল আগ্রহ দেখে জটাধারী তাঁকে মন্ত্র দিয়ে নিজের কাজ শেষ করে রামমূর্তিটি ঠাকুরকে দিয়ে গেলেন।

ঠাকুর বললেন,—সংসারে থাকবি তো মায়ার দাস হয়ে থাকবি কেন। তোর সমস্ত দায়-দায়িত্ব মার পায়ে অর্পণ করে শুধু মা-মা বলে ডাক। মা'ই তোর সব ভার বইবেন।

তবে আকুল না হলে হবে না। বললেন শিষ্যদের। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লাজ, লজ্জা, কুল, মান, ভয় সব ত্যাগ করে আকুল হয়ে ডাকতে হবে। যেমন আকুল হতেন শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের জন্য।

এরপর ঠাকুরকে কৃষ্ণপ্রেম মত্ত হতে দেখা গেল। সর্বদা শুধু হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে রোদন করেন। তারপর স্ত্রীবেশ ধারণ করলেন। স্ত্রীবেশে সজ্জিতা হয়ে নিজেকে কৃষ্ণ প্রণয়িনী ভেবে আকুল হয়ে উঠলেন, তখন তাঁর পুরুষের কোনো সত্বাই যেন ছিল না।

এমনি করে কিছুদিন কাটবার পর মথুরবাবুর বাড়ীতে গিয়ে থাকতে আরম্ভ করলেন। মথুরবাবুর অন্তঃপুরে ঠাকুরও একজন মহিলা হয়ে গেলেন। সেখানে তাঁর এমন অবস্থা হলো যে অন্যান্য লোকেও তাঁকে স্ত্রী ভাবতে শুরু করলো।

শ্রীকৃষ্ণের বিরহ বেদনায় ব্যাকুলিতা শ্রীরাধা অহরহ শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন জ্বালায় ছট্‌ফট্ করছেন। কতক্ষণে মোহন মুরলীধারী সামনে এসে দাঁড়াবেন তাঁকে স্পর্শ করে বলবেন, আর কেঁদনা রাই, আমি এসেছি। এই একমাত্র চিন্তা।

কিন্তু কোথায় সেই নবদূর্বাদল ভুবনমোহন শ্যাম? তিনি কি রাধিকার অন্তরের কথা শুনতে পাচ্ছেন না?

তাহলে হয়তো শ্রীরাধিকার রূপটি পূর্ণ হয়নি? পূর্ণ হতে হলে

রাধারাণীর কৃপা চাই। অতএব রাধারাণীর ধ্যান করতে আরম্ভ করলেন ঠাকুর।

শ্রীমতী শ্রীমতী বলে আকুলি-বিকুলী করতে লাগলেন। অবশেষে দর্শন দিলেন শ্যামবিলাসিনী রাই। রাধারাণী প্রকট হয়ে দেখা দিলেন, তারপর ঠাকুরের দেহেই মিলিয়ে গেলেন।

অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন দিলেন।

এই সময়ে ঠাকুরের শরীরে প্রেম, বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য, অনুরাগ, করুণা প্রভৃতি উনিশ রকম মহাভাবের উদয় হয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণ দর্শন দিয়ে ঠাকুরের শরীরেই লীন হয়ে গেলেন।

ভাগবত পাঠ শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে আছেন। অন্তর প্রদেশে মহাজ্যোতির্ময় রূপী নটবর শ্যাম প্রকাশিত হলেন। সেই জ্যোতির্ময় রূপের চরণ থেকে একটা বিদ্যুতের ছটা বেরিয়ে এসে ভাগবত গ্রন্থ-খানির উপর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে ঠাকুরের দেহে মিলিয়ে গেল।

ধীরে ধীরে সর্ব সাধনায় সিদ্ধ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শরীর মন জাগতিক সকল কিছু থেকে আশক্তি শূন্য হয়ে গেল। সর্বদাই তিনি নিজেকে ঈশ্বরের সঙ্গী বলে মনে করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণই যেন একমাত্র জগতের ত্রাণকর্তা।

শিষ্যরা মনে করতো যিনি ইচ্ছামত জগন্মাতার সাক্ষাৎ লাভ করেন, তাঁর আবার এত সাধন ভজন, যোগ ধ্যান'এর দরকার কি?

অজ্ঞান শিষ্যদের উত্তর দিলেন ঠাকুর। মা'র কাছে আছি বলে মায়ের একটা রূপই তো দেখছি। মায়েব অনন্ত সত্ত্বা দর্শন করতে হলে যে শক্তি দরকার তা অর্জন করে নিতে হয় সাধনার দ্বারা। তাতেও চাই মাতৃকৃপা।

* * *

রামকুমার মারা যাবার পর চন্দ্রমণি একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন।

এই দুটি সন্তানের মুখ চেয়ে জীবন ধারন করে আছেন তিনি। তাই রামকুমারের মৃত্যুর পর চন্দ্রমণি চলে এলেন দক্ষিণেশ্বরে।

দক্ষিণেশ্বরে এসে সংসারের দু'একটা কথা বাধ্য হয়েই বলতেন ছেলেকে।

সেদিন ঠাকুর অমনি মাকে তেড়ে মারতে গেলেন,—তুই আমাকে আবার বিষয়ী করবার জন্যে এসেছিস?

চন্দ্রমণি চুপ করে যান।

মথুরবাবু চন্দ্রমণির সব ভার নিলেন নিজের তত্বাবধানে। তিনি ডাকতেন দিদিমা বলে। প্রায় রোজই এসে কিছুক্ষণ আলাপ করতেন চন্দ্রমণির কাছে বসে।

মথুরবাবু ধরে বললেন,—দিদিমা তোমার ত কোনো সেবাই করতে পারলাম না, যা হোক কিছু নাও। বলো তোমার কি চাই।

অনেকক্ষণ চিন্তা করে চন্দ্রমণি বললেন, এখন কিছু চাই না, বাপু। দরকার হলে পরে চেয়ে নেব।

না, তা হয়না। এখনই কিছু নাও। বলেন মথুরবাবু।

এখন আর কিসের দরকার। হ্যাঁ, তুমি বরং দাঁত মাজা তামাক একটু আনিয়ে দাও, ওটা ফুরিয়ে গেছে।

মথুরবাবু আর থাকতে পারলেন না। চন্দ্রমণিকে প্রণাম করে বললেন, এমন মা না হলে কি তাঁর গর্ভে ঈশ্বর এসে জন্ম নেন।

পরমহংস তোতাপুরী ভারতের তীর্থসকল ভ্রমণ করে দক্ষিণেশ্বরে এলেন।

পবিত্র নর্মদা নদীর তীরে বহুকাল সাধনা করে নির্বিকল্প সমাধিতে ব্রহ্মলাভ করেছেন তিনি।

বাংলা দেশে এসে দক্ষিণেশ্বরে এলেন তোতাপুরী। তোতাপুরী কখনো কোথাও তিন দিনের বেশি থাকেন না।

কালীবাড়িতে এসে রাত্রিবাসের সংকল্প করলেন।

সন্ধ্যের পর গঙ্গার ঘাটে এসে দেখলেন ঘাটের একদিকে ঠাকুর উপবিষ্ট। একমনে কিছু চিন্তা করছেন।

ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি পড়তেই তোতাপুরী বুঝতে পারেন ইনি মহাপুরুষ।

এগিয়ে গিয়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি,—তুমি বেদান্তের সাধনা করবে?

চমকে উঠে তাকিয়ে দেখলেন ঠাকুর। দীর্ঘদেহী, উলঙ্গ, জটাধারী এক সন্ন্যাসী তাঁকেই বলছেন বেদান্ত শিখবার কথা।

নির্বিকারভাবেই তিনি বললেন,—আমি কিছু জানি না। ও সব মা জানেন।

তোতাপুরী হাসিমুখে বললেন,—বেশ, মাকে জিজ্ঞাসা করে এসো।

ঠাকুর উঠে গেলেন মাকে জিজ্ঞাসা করতে। ফিরে এসে বললেন, জগদম্বার আদেশ হয়েছে "তোকে শেখানোর জন্যই সন্ন্যাসী এসেছে।"

কিন্তু তোমাকে পৈতে ছেড়ে সন্ন্যাস নিতে হবে। বললেন তোতাপুরী।

ঠাকুর বলেন—এখানে আমার মা রয়েছেন, সন্ন্যাসটা যদি গোপনে নিলে হয় তবে আমার আপত্তি নেই।

বেশ তাই নাও।

তারপর পঞ্চবটী তলায় তোতাপুরীকে গুরুজ্ঞানে ঠাকুর দীক্ষা নিলেন। গুরুর প্রতিটি কথা পালন করলেন।

হোম শেষ হলে গুরু শিষ্য উভয়েই বসে আছেন। বহুক্ষণ কেটে যাবার পর ঠাকুর বললেন—নাঃ নির্বিকল্প সমাধি হচ্ছে না। যতবার চেষ্টা করছি ততবার মা কালীর মুখ মনে পড়ছে। আমার দ্বারা ওটা হবে না।

তোতাপুরী রেগে গিয়ে বললেন,—হতেই হবে। কেন হবে না।

তোতাপুরীর হাতের কাছে পড়েছিল একখণ্ড কাচ। সেটা তুলে নিয়ে ঠাকুরের ভ্রূর মধ্যে ফুটিয়ে দিয়ে বললেন,—মনটাকে এই বিন্দুতে এনে কেন্দ্রীভূত করো।

ঠাকুর তাই করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন তিনি।

রাত্রি শেষ হয়ে গেল সমাধি অবস্থায়। দিন এলো।

দিন গেল আবার এলো রাত্রি।

এই ভাবে তিনদিন কাটালো। সমাধিস্থ আর ভাঙ্গে না। ঠাকুরের দেহে প্রাণের কোন চিহ্ন নেই! কিন্তু সমগ্র শরীর থেকে যেন এক অপূর্ব প্রভা বেরিয়ে আসছে।

বিস্মিত হয়ে তোতাপুরী বললেন,—একি আশ্চর্য, দীর্ঘ চল্লিশ-বছর সাধনা করে যা আমি আয়ত্ব করেছি, এযে তিনদিনেই তা আয়ত্ব করে ফেলল। এ কি দৈবমায়া! চীৎকার করে ওঠেন তোতাপুরী।

তারপর দীর্ঘ এগারমাস তোতাপুরী তাঁর প্রিয় শিষ্যের সঙ্গে রইলেন। তারপর আবার পশ্চিমের পথে যাত্রা করলেন।

এই সময় গোবিন্দ রায় নামে একজন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ফকির এলেন দক্ষিণেশ্বরে। তাঁর সঙ্গে ঠাকুরের আলাপ হতে তাঁর মনে হলো ঈশ্বরকে লাভ করবার এও একটা পথ! আমিও এই পথে, এই মতে দীক্ষা নেব।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ।

সঙ্গে সঙ্গে কাছা খুলে নিয়মামাফিক মুসলমানের মতো নামাজ পড়তে লাগলেন। সারাদিন মুখে শুধু আল্লার নাম। অন্য কোনো নাম, কোনো চিন্তা নেই মনে। সমস্ত মনে প্রাণে তিনি ইসলাম।

তখন তাঁকে দেখে কারও বলবার ক্ষমতা নেই যে তিনি হিন্দু।

তিনদিনের মধ্যেই এক পরম জ্যোতির্ময় পুরুষের দেখা পেলেন ঠাকুর। উত্তীর্ণ হলেন আর একটি পরীক্ষায়।

সেদিন মথুরবাবু ছুটে এলেন ঠাকুরের কাছে।

মথুরবাবুর দ্বিতীয় স্ত্রী ভীষণ অসুস্থ। ডাক্তার কবরেজ আশা ছেড়ে দিয়েছে, তাই তিনি ছুটে এসেছেন ঠাকুরের কাছে। বললেন সব কথা।

ঠাকুর হেসে বললেন,—যাও তোমার স্ত্রী ভালো হয়ে যাবেন।

ঈশ্বর বাক্যজ্ঞানে মথুরবাবু ফিরে এলেন বাড়ী। সেইদিন থেকেই তাঁর স্ত্রী আশ্চর্যরকম তাড়াতাড়ি আরোগ্যলাভ করলেন।

ইতিমধ্যে ঠাকুর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দীর্ঘ ছয় মাস ধরে ভুগলেন। কিন্তু তার মধ্যে সাধনায় ব্যাঘাত হয়নি।

ছয়মাস পর ঠাকুর এলেন কামারপুকুর। তাঁর পুণ্য জন্মভূমিতে। গ্রামের সকলে দেখল আগেকার সেই গদাধরই রয়েছেন তিনি। এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। তেমনি প্রেমপূর্ণ ব্যবহার। সেই হরিনামে আত্মভোলা গদাধর।

খবর গেল জয়রামবাটি।

শ্রীসারদামণি সেখানে দিন গুনছেন স্বামী সন্দর্শনের।

শেষবার স্বামীকে দেখেছেন সাত বছর বয়সে। তারপর দীর্ঘ প্রতীক্ষা। স্বামী বিরহের একটা তীব্র জ্বালা তিলে তিলে দাহ করেছে সারদামণিকে।

খবর পেয়ে সারদামণি কামারপুকুর এলেন। দর্শন করলেন তাঁর পরমেশ্বরকে। মুহূর্তে তাঁর মন থেকে কামগন্ধ মিলিয়ে গেল। পবিত্র, স্বর্গীয় প্রেমভাব জেগে উঠলো তাঁর মনেপ্রাণে।

প্রাণভরে দেখলেন তাঁর পুণ্যদেবতা জ্যোতির্ময় শিবকে।

ঠাকুর এবার তাঁর সহধর্মিণীকে ভগবৎ প্রেমে শুদ্ধ করে তুলতে চেষ্টিত হলেন।

দীর্ঘদিন পর যেন হরপার্বতীর মিলন হলো।

ব্রাহ্মণী ভৈরবী আশঙ্কিত হলেন এই অপূর্ব মিলন দর্শনে। ভয় পেলেন পত্নীর প্রতি অসীম আকর্ষণ দেখে।

কিন্তু ঠাকুরের অসীম শক্তির কাছে কোনো অপবিত্রতাই ঘেঁষতে পায় না।

এদিকে সারদামণি ব্রাহ্মণীকে শ্বাশুড়ির মত সেবা যত্ন করতেন। আর ওদিকে ব্রাহ্মণী ক্রমশই ঠাকুরের উপর রেগে যেতেন।

অবশেষে ভৈরবীর চেতনা হলো। সকল অহঙ্কার চূর্ণ হলো।

সাতমাস পর ঠাকুর কলকাতায় ফিরলেন। এখন তাঁর শরীরে আর কোনো রোগ নেই।

কলকাতায় আসতেই মথুরবাবু ধরে বসলেন তাঁর সঙ্গে তীর্থযাত্রা করতে হবে ঠাকুরকে। তিনি প্রস্তুত হয়ে ঠাকুরের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

ঠাকুর স্বীকার করলেন মথুরবাবুর অনুরোধ। সঙ্গে যাবেন চন্দ্রমণি দেবী আর হৃদয়রাম।

একখানা দ্বিতীয় শ্রেণী আর তিনখানা তৃতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করা হলো। সব শুদ্ধ প্রায় একশ লোক যাবে একসঙ্গে।

শুভদিন দেখে শুরু হলো যাত্রা।

বৈদ্যনাথ ধাম হয়ে কাশী।

কাশীতে এসে প্রতিদিনই যেতেন বিশ্বনাথ দর্শন করতে। সঙ্গে যেতেন হৃদয়। কখনো কখনো মন্দিরে বা পথেই হয়তো ভাবাবেশ হতো। তখন হৃদয় সঙ্গে থেকে সামলাতেন ঠাকুরকে।

একদিন মণিকর্ণিকার ঘাটে গিয়ে মৌনাবস্থায় ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে

দর্শন করে হৃদয়কে বললেন,—দেখ হৃদে, ইনি সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর নরদেহে বিরাজ করছেন।

ভৈরবীর সঙ্গে আবার দেখা হলো কাশীতে। এবার সকলে যাবেন বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন থেকে ফিরবার সময় শ্যামকুণ্ড আর রাধাকুণ্ড থেকে রজ এনেছিলেন ঠাকুর। দক্ষিণেশ্বরে এসে সেই রজ ছড়িয়ে দিলেন সকল জায়গায়। বললেন,—আজ থেকে এ জায়গাও বৃন্দাবনের মতো দেবভূমি হলো।

এই সময়ে হঠাৎ হৃদয়ের স্ত্রী বিয়োগ ঘটলো।

আজীবন ভোগবিলাসী হলেও শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ পাবার পর তার মনের কোণে একটু একটু করে ধর্মের বীজ সঞ্চিত হচ্ছিল।

স্ত্রী বিয়োগের পর সেটা প্রকাশ পেল। সবকিছু ভুলে গিয়ে পুজোয় মন দিল হৃদয়। ঠাকুরের মত ধ্যান করবার বাসনা জাগলো মনে। সকলের অলক্ষ্যে ধ্যানে বসেছেন হৃদয়রাম। কয়েকদিনের মধ্যে তাঁরও নানারকম দিব্যদর্শন হতে লাগলো।

একদিন সরাসরি ঠাকুরকে গিয়ে বললেন,—আমাকে তোমার অবস্থা করে দিতে হবে।

ঠাকুর বললেন,—তার আমি কি করব। মা'র ইচ্ছে হলেই হবে।

হ'লও তাই। হৃদয় জ্যোতির্ময়ের দর্শন করতে লাগলেন।

ঠাকুর যেখানেই যান, হৃদয় ঠিক তাঁর পাশেই থাকেন। কি জানি কখন কি দরকার হয়।

ঠাকুর চলেছেন পঞ্চবটী। হৃদয় চলেছেন পিছনে পিছনে।

হঠাৎ যেন কি হয়ে গেল হৃদয়ের চোখের সামনে। তাকিয়ে দেখলেন ঠাকুরের দেহের জ্যোতিতে সারা পঞ্চবটী আলো হয়ে গেছে। ঠাকুর যেন মানুষই নন। চলছেন কিন্তু মাটিতে পা পড়ছে না।

হৃদয় ভাবলেন বুঝি চোখের ভুল।

চোখ মুছে আবার তাকালেন। আবার সেই দৃশ্য দেখলেন।

এবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখে আরো আশ্চর্য হলেন হৃদয়। তিনি দেখলেন ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর ভেদ নেই কোথাও। একটাই জ্যোতি থেকে দুটি অংশ বেরিয়ে এসেছে। তার একজন শ্রীরামকৃষ্ণ, অন্যজন হৃদয়রাম নিজে।

হৃদয়ের তখন অর্ধচেতন অবস্থা। তবুও চীৎকার করে বলতে লাগলেন,—ও রামকৃষ্ণ, এই দেখ তুমিও যা আমিও তাই। আমরা মানুষ নই। চলো আমরা বেরিয়ে পড়ি জগৎ উদ্ধার করতে।

ঠাকুর বার বার নিষেধ করলেন চীৎকার করতে। কিন্তু তখনকার কথা কে শোনে। আনন্দের প্রাবল্যে হৃদয়ের অবস্থা তখন অন্যপ্রকার।

প্রায়ই এমনি করতে থাকেন হৃদয়। ঠাকুরের কথায় কান দেন না। তখন বাধ্য হয়ে ঠাকুর বললেন—দে মা শালাকে জড় করে।

অমনি হৃদয়ের দেহটা ভারী হয়ে গেল। একমুহূর্তে চোখের সামনে সবকিছু যেন বদলে গেল। মামার দিকে তাকিয়ে বললেন,—একি করলে মামা?

ঠাকুর বললেন, তোর সময় হয়নি এখনো। এইটুকুতেই যা গোলমাল শুরু করেছিস। এখন থাক অমনি করে, সময় হলে আরো অনেক কিছু পাবি।

হৃদয় ভাবলেন মামাকে না জানিয়ে তিনি সিদ্ধিলাভ করবেন। সাধনা করবেন মামার অগোচরে। আবার সেই আগেকার অবস্থা পেতেই হবে।

তারপর একদিন গভীর রাত্রে পঞ্চবটীতলায় গিয়ে উপস্থিত হলেন ধ্যান করবার জন্য।

মনস্থির করে যেই বসেছেন হৃদয়, অমনি চীৎকার করতে লাগলেন, মামাগো, পুড়ে মলুম গো।

ঠাকুর ঐ দিক দিয়েই যাচ্ছিলেন। হৃদয়ের চীৎকারে ছুটে এসে বললেন কি হয়েছে, চীৎকার করছিস কেন?

হৃদয় বললেন,—এখানে এসেছিলাম ধ্যান করবার জন্য, এসে বসতেই কে যেন আমার গায়ে এক গামলা আগুন ঢেলে দিল। সমস্ত দেহটা আমার পুড়ে গেল গো।

ঠাকুর মৃদু হেসে সস্নেহে হৃদয়ের গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, তোর আবার এসব ঝামেলা করা কেন? তোকে ত বলেছি, আমার সেবা করলেই তোর সব হবে।

ঠাকুরের স্পর্শে হৃদয়ের সব জ্বালা একমুহূর্তে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এবার তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস হলো মামার কথায়। এও বুঝলেন, ঠাকুরের অগোচরে কিছু করতে যাওয়া মানে বিপরীত ফলভোগ করতে হবে।

* * * *

মথুরবাবুর পায়ে ফোড়া হয়েছে। খুব কষ্ট পাচ্ছেন। সংবাদ পেয়ে ঠাকুর গেলেন দেখতে।

মথুরবাবু বললেন, পায়ের ধুলো দাও।

ঠাকুর হেসে বললেন,—পায়ের ধুলোয় কি ফোড়া সেরে যাবে?

মথুরবাবুও যেন তেন পাত্র নন। বললেন,—তা কেন, ফোড়ার জন্যে ত ডাক্তার কবরেজ রয়েছে। ঐ ধুলো নিয়ে আমি ভবসাগর পাড়ি দেব।

ভবসাগরের কথা শুনে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন ঠাকুর। ভাবাবেশের মধ্যেই বললেন,—মথুর, তুমি যতদিন আছো, আমিও দক্ষিণেশ্বরে ততদিনই থাকব।

চমকে উঠলেন মথুরবাবু। সে কি ঠাকুর? আমার স্ত্রী আর ছেলেও যে তোমার ভক্ত। ওদের ছেড়ে কোথায় যাবে?

বেশ, তাহলে ওরা যতদিন আছে, ততদিন থাকবো।

আশ্বস্ত হলেন মথুরবাবু।

মথুরবাবুর শরীর ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়লো। ইতিমধ্যে কয়েকবার গিয়ে দেখে এসেছেন ঠাকুর।

কিন্তু শেষদিন গেলেন না। হৃদয়কেও যেতে দিলেন না।

মথুরবাবুর শেষ মুহূর্তে ঠাকুর সূক্ষ্ম শরীরে গিয়ে জ্যোতির্ময় মূর্তিতে তাঁর হাত ধরে দাঁড়ালেন। ধন্য মথুরমোহন।

সমাধি ভেঙ্গেই হৃদয়কে ডেকে বললেন,—হৃদু, মথুর চলে গেল। মা'র সখীরা এসে ওকে রথে করে নিয়ে গেল।

সময় তখন পাঁচটা।

রাত্রে কালী বাড়ীর কর্মচারীরা এসে বললো—ঠিক পাঁচটায় মথুরবাবু দেহত্যাগ করেছেন।

এমনি করে স্নেহের পাত্ররা অনেকেই চলে গেলেন ঠাকুরের চোখের সামনে।

সতের বছর বয়সে অক্ষয় দক্ষিণেশ্বরে এসেছিল পূজারী হয়ে। ঠাকুর প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসেন তাঁর ভাইপোকে।

রামকুমার জানতেন ছেলে বেশীদিন বাঁচবে না। তাই তিনি কখনো ছেলেকে কোলে করেন নি।

ঈশ্বরে অসীম অনুরাগ অক্ষয়ের। আত্মভোলা হয়ে পুজো করে অক্ষয়। বিয়ের কিছুদিন পর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে একবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। সুস্থ হয়ে ফিরে দক্ষিণেশ্বরে এসে আবার পুজোয় মন দিল।

কিন্তু কিছুদিন যেতেই আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার সব রকম সুব্যবস্থা হলো, কিন্তু ঠাকুর হৃদয়কে ডেকে বললেন—ওর লক্ষণ ভালো নয়।

ঠিক একমাস পর অক্ষয় মারা গেল। হৃদয় তখন কেঁদে বুক ভাসাচ্ছেন। অথচ ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে ভীষণ জোরে অট্টহাসি হাসছেন। সে হাসি যেন আর থামতে চায় না।

বহুদিন যাবত স্নেহের ভাইপো অক্ষয়ের অভাব ঠাকুরের মনকে পীড়া দিয়েছে।

সেবার হৃদয় বললেন, মামা আমি বাড়িতে গিয়ে পূজো করব, তোমাকে যেতে হবে। মথুরবাবু তখন বেঁচে আছেন। তিনি হৃদয়কে টাকা পয়সা সব দিলেন, কিন্তু ঠাকুরকে ছাড়লেন না।

মামা যাবে না শুনে হৃদয়ের মন খারাপ হয়ে গেল।

ঠাকুর তখন হৃদয়কে ডেকে বললেন,—মন খারাপ না করে গিয়ে পূজো কর। আমি সূক্ষ্ম শরীরে রোজ গিয়ে তোর পূজো দেখে আসব। একমাত্র তুই আমাকে দেখতে পাবি। আর কেউ নয়।

হ'লও তাই। হৃদয় পূজো করছেন। সপ্তমীপূজার মহালগ্নে তাকিয়ে দেখলেন ঠাকুর জ্যোতির্ময় বেশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

*   *   *   *

ঠাকুরের সম্বন্ধে নানা কথা সারদামণিরও কানে যায়। সব কথাই তিনি মুখ বুজে সহ্য করেন। মাঝে মাঝে মনে হয় একবার নিজের চোখে দেখে এলে সব সন্দেহ দূর হয়।

ভাবতে ভাবতে একদিন বাবার হাত ধরে বেরিয়ে পড়লেন কলকাতার পথে। নিদারুণ পথকষ্ট করেও অম্লান মুখে এসে দাঁড়ালেন ঠাকুরের সামনে। ঠাকুর হেসে বললেন,—এতদিনে আসতে হয়? আর সে সেজবাবু নেই যে তোমায় যত্ন করবে।

অবাক হয়ে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকেন সারাদামণি। লোক যে তবে ওকে পাগল বলে? কোথায় পাগল? মনের সমস্ত চিন্তা, ভাবনা, পথের ক্লেশ এক মুহূর্তে কোথায় উড়ে গেল।

রাত্রে শোবার পর সারদার দিকে তাকিয়ে জগদম্বার উদ্দেশ্যে ঠাকুর বললেন মা, ওর মন থেকে কামভাব দূর করে দে। জগদম্বা শুনলেন সে কথা।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন সারদামণিকে,—তুমি কি চাও আমি আমার কর্তব্যের পথ থেকে চ্যুত হই ?

শ্রীমা বললেন, তা কেন, তুমি নিশ্চয়ই তোমার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবে। তোমার সিদ্ধিতেই তো আমার সিদ্ধি। আমিও চাই তুমি সিদ্ধিলাভ করো।

এমনি করে সাত মাস কাটলো। ঠাকুর নানাভাবে পরীক্ষা করলেন সারদাকে। সারদার মনে বাসনার উদয় হলো না।

ঠাকুর ষোড়শী পূজো করবেন। হঠাৎ মনে হলো ঘরেই তো রয়েছেন ষোড়শী। সারদাকে জানালেন সে কথা।

পূজোর আয়োজন শেষ হতে সারদামণি এসে বসলেন আসনে। ঠাকুর বিধিমত পূজো করলেন। পূজো চলতে চলতে সারদামণি বাহ্যজ্ঞান হারালেন।

ঠাকুরও সমাধিস্থ হয়ে পড়েছেন।

পূজো শেষ হলে তাঁর সাধনা আর জপের মালা অর্পণ করলেন সারদামণির পাদপদ্মে। তারপর প্রণাম করলেন।

আবেশ ভরে সারদামণি বাইরে চলে এলেন। বাইরে গিয়ে প্রণাম ফিরিয়ে দিলেন ঠাকুরকে।

ষোড়শী পূজার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সাধনজীবনের শেষ হলো বলা যায়। তার পরের যুগটাকে বলা যায় লীলাযুগ।

* * * *

পৃথিবীতে প্রচলিত প্রধান সকল ধর্মমত গুলিতেই শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। সকল ধর্মাবতারদেরই তিনি অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন এবং সকল ধর্মেই ছিল তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি।

তিনি প্রমাণ করলেন, যত মত, তত পথ। সব পথই এক অদ্বিতীয় অনন্ত ঈশ্বরে গিয়ে লীন হয়েছে।

তিনি বলেছেন, যে পথে তোমার রুচি, সেই পথে যাও, তোমরা

শুধু উদ্দেশ্য হবে ঈশ্বরের ঘনিষ্ট হওয়া। ঈশ্বরপ্রাপ্তিই হবে মূল উদ্দেশ্য—ধর্মাচরণ নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমেই অনুভব করেছেন, তাঁর হাতেই আসবে জীবের মুক্তি। তাই সকল সাধন ভজন শেষ করে অপেক্ষা করতে লাগলেন তাঁর প্রিয় শিষ্যদের জন্য।

ঠাকুরের কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজী বলতেন—তাঁর একটা কথাকে নিয়ে এক ঝুড়ি দর্শন লেখা যায়। তিনি দৈনন্দিন ব্যবহারিক উপদেশ প্রসঙ্গে যে কথাগুলি বলতেন, সেগুলি অত্যন্ত সহজ ও সরল। যে কেউ বুঝতে পারে এমন করে গুছিয়ে এবং ছোট করে বলতেন। অথচ তার অর্থ যে কি বিরাট তা ভাবতে ভাবতে শেষ করা যায় না। যতই ভাবো, সেই ছোট্ট কথাটি ক্রমশঃ গভীর থেকে গভীরতর হয়ে দাঁড়ায়।

তিনি বলতেন ভক্তই ভগবান। আত্মাই নারায়ণ। সব জীব মাত্রেই শিবের অংশ। যেদিন সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করতে পারবে সেইদিনই হবে তোমার পূর্ণদর্শন। তারপর আর দরকার নেই কিছুরই।

উদাহরণ দিয়ে স্বামিজী বললেন গিরিশচন্দ্রের কথা।

ঠাকুরের পায়ে তাঁর সবকিছু সমর্পণ করে গিরিশ বললেন,—এবার আমি কি করবো ঠাকুর ?

ঠাকুর বললেন, অত্যন্ত সহজ এবং ছোট্ট একটি কথা। যা করছো তাই করো। ওটাও তো ঈশ্বরেরই কাজ। তবে সকাল-সন্ধ্যা ঈশ্বরের স্মরণ মননটা বজায় রেখো।

শুনে গিরিশচন্দ্র মহা ভাবনায় পড়লেন। ঠাকুর একটা সামান্য কাজ দিয়েছেন। শুধু দু'বেলা একটু স্মরণ মনন। কিন্তু তাও কি তিনি পারবেন ? কোন কাজের মধ্যে কখন ভুল হয়ে যায় তার ঠিক কি ?

গিরিশচন্দ্রের মনের কথা বুঝতে পারলেন ঠাকুর। তখন আবার

বললেন, বেশ তা যদি না পারো তাহলে খাবার শোবার আগে একবার তাঁকে স্মরণ করো।

তাই বা কেমন করে হবে। ভাবলেন গিরিশচন্দ্র। খাবার বা শোবার ত কোন স্থিরতা নেই তাঁর। গিরিশচন্দ্র মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এতটুকু একটা সোজা কাজ, তাও হয়তো পারবেন না নিয়ম মত করে যেতে।

ঠাকুর তখন হেসে বললেন তাও যদি না পারিস তবে বকলমা দে।

এবার গিরিশচন্দ্র নিশ্চিন্ত হলেন। ঠাকুরকে বকলম দিলেন। অর্থাৎ ঠাকুর তাঁর সকল ভার নিজে গ্রহণ করলেন।

গিরিশচন্দ্র তখন বুঝতে পারেন নি যে, ঠাকুর ভার নিলেন কথাটার অর্থই হলো আমৃত্যু গিরিশচন্দ্র তাঁর ভালোবাসার বন্ধন স্বীকার করে নিলেন। সদা সর্বদাই গিরিশচন্দ্রের মনে সেই এক চিন্তা। ঠাকুর তাঁর ভার নিয়েছেন। গিরিশের অহংভাব মিলিয়ে গেল ঠাকুরের চিন্তায়। অর্থাৎ সেই চিন্তার মধ্যেই ঠাকুর তাঁকে ধ্যান করিয়ে নিচ্ছেন।

বেশ কিছুদিন পর গিরিশচন্দ্র নানা দুঃখ-দুর্দশায় বিচলিত হয়ে ঠাকুরের কাছে গেলেন। ঠাকুর বললেন যাঁর উপর তুই ভার দিয়েছিস তিনি তোর ভালোর জন্যেই সব করছেন। তোর তাতে ভাবনা-চিন্তার দরকার কি ?

গিরিশ আর কি বলবেন। শুধু বললেন,—তখন কি এতটা বুঝতে পেরেছিলাম ?

সকলেই ঠাকুরের সব কথার গূঢ় অর্থ বুঝতে পারে না। যেমন সব ক্ষেত্রেই হয় না ফসল। তার জন্যে ক্ষেত্র তৈরী করতে হয়। তেমনি ঠাকুরের কথার সারমর্ম বুঝতে হলে তৈরী করতে হবে মনকে।

সেজন্যেও ঠাকুর বলেছেন, বিচলিত হসনা। কালে হবে। বিঁচি পুঁতলেই কি গাছ পাওয়া যায় ?

একজন যুবক এসে প্রশ্ন করেন—কামভাব দূরীভূত হয় কেমন করে ?

ঠাকুর বললেন, ভগবৎ দর্শন না হলে কামাভাব যায় না। আসলে ও সবই তো শরীরের ধর্ম। শৌচ প্রস্রাবের মতো মনে করিস আর খুব করে হরিনাম করিস। তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে, তবেই যাবে।

যখন ভগবৎ প্রেম আসবে তখন দেখবি আর ও সব নেই। যখন বানের জল বাঁধ মানে না, এটাও তেমনি।

প্রতিটি ব্যবহারিক কথার মধ্যে ঈশ্বরলাভের এমন অদ্ভুত সহজ পন্থা দেখিয়ে দিতেন যে ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

একদিন একজন স্ত্রীলোক এসে বললেন—ধ্যানে বসলেই আমার সংসারচিন্তা মনে পড়ে, ধ্যানে বসতে পারি না। এর একটা উপায় বলে দিন।

অন্তর্যামী ঠাকুর বুঝলেন আসল কারণটা কোথায়।

ধ্যানে বসলে কার মুখ মনে পড়ে গো ? প্রশ্ন করলেন ঠাকুর। মহিলাটি তাঁর এক ভাইপোকে মানুষ করছিলেন। বললেন তার কথা।

ঠাকুর সব শুনে বললেন,—সে ত ভালো কথা। ভাইপোর সেবা করো। কিন্তু গোপাল ভেবে। মনে করো তার জন্য যা কিছু করছো সব গোপালকে করছো। যেন গোপালরূপী ভগবানের জন্যেই করছো সব। যেমনি ভাব তেমনি লাভ।

এমনিভাবে যেমন পুরুষ তেমনি স্ত্রীদের সঙ্গে একেবারে একাত্মা হয়ে মিশে গিয়ে কথা বলতেন, উপদেশ দিতেন। যেন সকলেই ঠাকুরকে তারই একান্ত আপনার বলে ভাবতে পারে।

যখন স্ত্রীদের সঙ্গে মিশতেন তখন যেন তিনি স্ত্রী হয়ে যেতেন ; আবার পুরুষের সঙ্গে পুরুষ। এইভাব দেখে একদিন গিরিশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন,—ঠাকুর আপনি পুরুষ না প্রকৃতি।

ঠাকুর হেসে বললেন—জানি না। ভাবলে ও দুটো আলাদা। না ভাবলে এক।

একজন ভক্ত বললে—আপনি ত লেখাপড়া তেমন করেন নি, তা এত সব জানলেন কি করে ?

ঠাকুর বললেন, ঢের শুনেছি গো। সব আমার মনে আছে। সব শেখার পর মার পায়ে সব অর্পণ করে ভক্তিভাবটুকু চেয়ে নিয়েছি।

আর একজন বেদান্তবাদী যুবক রাশি রাশি বই পড়েন। বেদান্তের বিষয় দিনরাত তর্ক করেন। ঠাকুরের কাছে বসে তিনি বেদান্ত শুরু করলেন।

একদিন ঠাকুর তাকে বললেন—তোমার বেদান্ত মানে তো ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা. এই তো, না আরো কিছু বলছে ?

যুবকটি অবাক হয়ে বললেন,—না আর কি।

মনে মনে যুবকটির আশ্চর্যের সীমা থাকে না। এতদিন এতসব বই পুস্তক ঘাঁটাঘাটি করে এত ছোট ও সহজ কথাটি ত বুঝতে পারেন নি।

কিছুদিন পর বলরাম বসুর বাড়িতে ঠাকুর গেছেন বেড়াতে। হঠাৎ সেই যুবকটি এসে প্রণাম করে বলল—ঠাকুর, আপনার কথাই ঠিক। জ্ঞান, ভক্তি, দর্শন এই তিনটে ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া হয় না।

ধ্যান করবার কথা বলে ঠাকুর বললেন, ঐ যে ভ্রু দুটোর মাঝখানে যে জায়গাটা আছে, ঐখানটাতে তোমার সমস্ত মনপ্রাণ এসে জড়ো করো তাহলেই সমাধিভাব আসবে ধীরে ধীরে।

ধ্যান করবার সময় ভাববে যেন তোমার মনটা রেশমের দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে ইষ্টের পাদপদ্মে। সেখান থেকে সে বাঁধন খোলা যাবে না, খোলা যায় না। আর ঈশ্বরের সামনে একটা প্রদীপ জ্বেলে রাখবে। সেটা যেন নিভে না যায়, তাহলে গেরস্তর অকল্যাণ হয়।

আবার নিরাকারবাদীদের উদ্দেশ্য করে বললেন,—মনে করো ঈশ্বর সাগরের জলের মত গভীর ও পরিপূর্ণ। তুমি সেখানে একটি মাছ মাত্র অগাধ জলে ডুবে আছো। কখনো ভাসছো, কখনো ডুবছো।

ভাবলেই ভাবের উদয় হবে। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক পাতানোর নাম ভাব। এমন বিশ্বাস রাখতে হবে যে তাঁকে আমি পাবোই। তার আগে মন থেকে কামনা বাসনাগুলো পুরনো কাপড়ের মত ছেড়ে ফেলতে হবে।

এছাড়া প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়েও ঠাকুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকতো। একবার শ্রীশ্রীসারদামণিকে শিক্ষা দেবার ছলে ঠাকুর বললেন, গাড়িতে বা নৌকায় উঠবার সময় উঠবে সকলের আগে। আর নামবার সময়ে সবচেয়ে পিছনে সব দেখেশুনে নামবে।

একবার প্রতাপ হাজরা ঠাকুরের সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে ফিরবার সময় তাঁর গামছা ফেলে এলেন। ঠাকুর বললেন,—আমি না হয় ভগবানের নাম করতে করতে গায়ে কাপড় রাখতে পারি না, তাই বলে ঘটি গামছা তো কোথাও ফেলে আসিনি কখনো। আর সামান্য একটু ধ্যান করেই তোমার এত ভুল ?

সত্যিই তাই। ঠাকুর যে জিনিষ ব্যবহার করতেন, প্রতিদিন প্রতিবার ঠিক একই জায়গায় হিসেব মত রাখতেন। কখনো এতটুকু ভুল হয়নি।

:

স্বামিজী তাঁর গুরুর সম্বন্ধে বলতেন, মনের বাইরের জড় শক্তিটা

কোনো না কোনো উপায়ে সকলের পক্ষে একত্র করা এমন কিছু শক্ত নয়, কিন্তু এই পাগলা বামুন মানুষের মনগুলোকে কাদার তালের মত হাতে নিয়ে অবলীলাক্রমে নিজের খেয়াল খুশীমত গড়ছেন ভাঙছেন, যেমন খুশী ছাঁচে ফেলে রূপ দিচ্ছেন নতুন নতুন, এর চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার জগতে আর কিছু নেই।

শৈশবকাল থেকেই সকলকে সৎপথে চালিত করবার প্রবণতা ঠাকুরের মধ্যে ছিল যথেষ্ট। নিজে ফলভোগ করে তিনি অপরকে দেখাতেন, শিক্ষা দিতেন।

নিজের জন্যে তিনি কখনোই কিছু করেননি। জগৎকে মুক্ত করবার জন্য বহুজনের সুখের জন্য, বহুজনের হিতের জন্যেই তিনি আজীবন কঠিন তপস্যা করেছেন।

দীর্ঘ ছয়মাস নির্বিকল্প সমাধির মধ্যে লীন হয়ে থেকেছেন মানব-কল্যাণের জন্য। নিজের মুখে বলেছেন ঠাকুর—মাত্র একুশ দিন এমনি অবস্থায় থাকলে ঝরাপাতার মত শরীর ঝরে যায়।

শুধুমাত্র জগতের কল্যাণের জন্যেই নির্বিকল্প থেকে আবার বাস্তব জগতে ফিরে এসেছিলেন।

সাধারণ মানুষের কাছে যা অকল্পনীয়, সেই বিষয়কে সহজ করে দেবার জন্যেই যেন তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল।

তাঁর যোগারূঢ় অবস্থা বোঝাবার জন্য তিনি বলেছেন,—অনুভব একটা পা থেকে মাথায় গিয়ে একবার উঠলে আর হুঁশ থাকে না। তখনই বুদ্ধির শেষ হয়। আমি তুমি ভেদ আর তখন থাকেনা। ভ্রু-যুগলের ঠিক মাঝখানটাতে মনটাকে নিয়ে যেতে পারলেই পরমাত্মার দর্শন হয়। তারপর আর কিছুরই দরকার হয় না।

ভাবের উপলব্ধি সম্বন্ধেও তিনি বলেছেন,—বেদ-বেদান্তে যা লেখা আছে, আমার উপলব্ধি তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি দূর প্রসারিত।

গুরুগিরি করা পছন্দ করতেন না ঠাকুর।

অথচ জগদগুরুর পদ গ্রহণ করবার জন্যেই আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি।

কেউ তাঁকে বাবা বা গুরু বললেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলতেন, আমি কেউ নয়, ঈশ্বরই সব।

এমনি করে নিজেকে দীনতম করে সকলের পদধূলি গ্রহণ করেছেন মানুষকে নারায়ণ জ্ঞানে। তাঁর চেতনায় কখনো তাঁর বিরাটত্বের প্রকাশ ছিল না।

তিনি যখন সমাধিস্তরে নেমে যেতেন তখন তিনি নিজ মানবরূপ ভুলে গিয়ে ঈশ্বর প্রতিমে প্রকাশমান হতেন। আবার যে সেই সাধারণ মানুষ।

ঠাকুরের জীবনের যা কিছু ঘটনা, সবই লোকশিক্ষার জন্য।

এমন কি বিবাহ করাটাও জগতে একটা বিস্ময়কর নিদর্শন।

বিবাহ করা এবং বিবাহের পর ব্রহ্মচর্য পালন, এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ।

শিষ্যদের বলতেন ব্রহ্মচর্যের কথা। কিন্তু ব্রহ্মচর্য কি তার অদ্বিতীয় প্রমাণ দেখিয়ে দিলেন নিজের জীবনের দিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করে।

শ্রীশ্রীসারদামণিকে সহধর্মিনী করে জগতের সামনে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী জগন্মাতা বলে প্রমাণ করিয়ে দিয়ে গেলেন।

তাঁর সবকিছু মাকে দান করে বললেন, আমার সব তোমাকে দিলাম জগৎকল্যাণে এবার তুমি নিজেকে কাজে লাগাও।

বিবেকানন্দ বলেছেন,—যাঁরা গুরু বা নেতা হন, সেই ক্ষমতাটি তাঁরা জন্মলগ্নে আয়ত্ব করে থাকেন।

যাঁর আচরণ মাত্রেই সদভাবাপন্ন, প্রতিটি মানুষ তাকে চাইবে অনুসরণ করতে।। তাই তিনি গুরু।

তাঁকে যে চিনেছে সেই তরে গেছে ভবসাগর পাড়ি দিয়ে।

রাণী রাসমণিও তাঁর পূজারী ব্রাহ্মণের হাতের চড় খেয়ে তাঁর পায়ে মাথা নত করলেন।

সেদিন রাণী এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। চারিদিকে লোকজনের ছুটোছুটির অন্ত নেই আদর অভ্যর্থনার জন্য।

পূজো শেষে মন্দিরে বসে আহ্নিক করছেন রাণী। ঠাকুর বসে আছেন পাশে। খানিক পরে রাণী অনুরোধ করলেন ঠাকুরকে একটি গান গাইতে।

ঠাকুর তাঁর সুললিত কণ্ঠে গান ধরেছেন।

রাণীও সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মুগ্ধ।

হঠাৎ তাঁর কুসুমকোমল গালের উপর পড়লো ঠাশ করে এক চড়। রাণী আশ্চর্য হয়ে গেলেন। সামান্য পূজারী বামুনের এ কি ব্যবহার?

চমকে গিয়ে ছুটে এলো সকলে। হয়তো এর বিহিত করবার আদেশ হবে রাণীর মুখে।

রাণী আর ঠাকুর স্তব্ধ হয়ে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন উভয়ে উভয়ের দিকে। ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে হাসির রেখা দেখা দিল।

রাণী তখন অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছেন মনে মনে। তিনি বুঝতে পারলেন, মা'র ধ্যানে বসে মামলার কথা ভাবছিলেন।

সম্বিত ফিরে পেয়ে সকলকে বললেন,—ওকে কিছু বলোনা, দোষ আমিই করেছি।

রাণী রাসমণি, মথুরবাবু প্রভৃতি বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যাঁর অনুগত, তাঁর কিন্তু আনুগত্যের অহঙ্কারের এতটুকু হুঁশ নেই।

ঠাকুর কখনোই মনে করতেন না যে তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের অংশ রয়েছে।

পরে একদিন নরেনকে বললেন,—ওরে নরেন শোন এরা বলছে কি।

অবাক হয়ে নরেন তাকালেন ঠাকুরের দিকে, কি বলছেন?

বলছে আমি নাকি ঈশ্বরের অবতার।

নরেন বললেন,—যে যা বলে বলুকগে, আমি প্রমাণ না পেলে মানতে রাজী নই।

ক্রমে ক্রমে তোতাপুরী আর ভৈরবীর আগমনে ও নিরন্তর কুটতর্কের মাধ্যমে জগৎ সমক্ষে ঈশ্বর অবতার বলে প্রতিষ্ঠিত হলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

ঠাকুরের এখন সম্পূর্ণ দিব্যাবস্থা। দীন শরণাগতকে ডেকে ডেকে মুক্তির পথে এগিয়ে দিচ্ছেন। সকলকে বলছেন,—ওরে তোরা সব দল বেঁধে জগতের কাজে নেমে পড়। মা তোদের কল্যাণময়ী।

দিব্যাবস্থায় সমাধিলাভ বা অর্ধচৈতন্য অবস্থাকে কেউ কেউ অবশ্য অন্য দৃষ্টিতে বিচার করতেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী ঠাকুরের এই অবস্থাকে স্নায়ুবিকার বলে মনে করতেন।

নারায়ণ শাস্ত্রী বিরাট শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। কাশীতে পঁচিশ বছর গুরুগৃহে থেকে সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলে খ্যাতিমান হয়েছেন।

একবার নারায়ণ শাস্ত্রী এলেন নবদ্বীপে পূর্ণজ্ঞান লাভ করবার জন্য। ফিরবার পথে নেহাৎ কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে দক্ষিণেশ্বরে এলেন। শাস্ত্রীমশাই জানতেন পাঠ অধ্যয়ন ছাড়া বেদান্ত আয়ত্ব করা অসম্ভব। তাঁর মনে একটা হালকা বৈরাগ্যের আবরণ ছিল।

কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরকে দর্শনমাত্র তিনি দেখতে পেলেন দিব্যালোক। আদি, অন্তহীন, অসীম, অরূপ দিব্যপুরুষের সাক্ষাতে ধন্য হলেন তিনি।

শাস্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে ক্রমশঃ ঠাকুরের হৃদ্যতা গাঢ় হয়ে উঠল। মনে মনে স্থির করলেন তিনি,—এত কাছে ঈশ্বরকে ছেড়ে আর কোথাও যাবেন না।

পণ্ডিতের মনের গোপন কন্দরে নাম যশের জন্য যে মোহ ছিল মুহূর্তে তা যেন সূর্যালোকের ছোঁয়া পেয়ে উড়ে গেল। ঠাকুরের শরণাগত হলেন পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রী।

এই সময়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত একদিন দক্ষিণেশ্বরে এলেন। নিজের চোখে একবার ঠাকুরকে দেখবেন এই আশায় এসেছেন তিনি।

নারায়ণ শাস্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর এলেন মধুসূদনের সামনে।

শাস্ত্রীমশাই মধুসূদনকে বললেন, আপনি পরধর্ম গ্রহণ করলেন কেন?

মধুসূদন উত্তর দিলেন,—পেটের দায়ে।

ছিঃ ছিঃ পেটের দায়ে ধর্মত্যাগ করলেন আপনি? এর চেয়ে মরণও যে ভালো ছিল।

মধুসূদন চুপ করে থেকে ঠাকুরের মুখের দিকে চাইলেন। তাঁর ইচ্ছা ঠাকুর কিছু বলুন।

ঠাকুর গান গেয়ে শোনালেন মধুসূদনকে। তিনি প্রসন্নচিত্তে চলে গেলেন।

কিছুদিন পর শাস্ত্রীমশাই ঠাকুরকে ধরলেন সন্ন্যাসে দীক্ষা দেবার জন্য।

শুভদিন দেখে ঠাকুর দীক্ষা দিলেন। দীক্ষা নিয়ে কিছুদিন থেকে নারায়ণ শাস্ত্রী দক্ষিণেশ্বর থেকে বিদায় নেন।

বর্ধমান রাজসভায় একবার বিরাট তর্কসভা বসেছে।

শিব বড়ো না বিষ্ণু বড়ো।

সেই সভায় এলেন পণ্ডিত পদ্মলোচন। প্রশ্ন শুনে তিনি বললেন, সবাই বড়ো। অর্থাৎ যিনি যার ইষ্ট, তিনি তাঁর কাছে নিশ্চয় বড়ো। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন ত আমি বলব, আমার চৌদ্দ পুরুষের কেউ শিব বা বিষ্ণুকে দেখেন নি। অতএব কে বড়ো আর কে ছোট তা বলা শক্ত। তবে শৈবশাস্ত্রে শিব আর বিষ্ণুশাস্ত্রে বিষ্ণুকে বড়ো করে দেখানো হয়েছে।

আসলে দুই দেবতাই অপরিমেয়। কারো সঙ্গে কারো তুলনা করা যায়না বা উচিতও নয়।

বর্ধমান থেকে কলকাতায় এলেন পদ্মলোচন।

সংবাদ পেয়ে ঠাকুর নিজে গেলেন তাঁকে দেখতে। প্রথম দর্শনেই দুজনের মধ্যে একটা নিবিড়তা গড়ে উঠলো অল্প সময়ের মধ্যে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দেব পরিমণ্ডলের জ্যোতিতে পণ্ডিত পদ্মলোচন একদিন তাঁকে ইষ্টকালে স্তব করে মুক্তকণ্ঠে প্রচার ক'রলেন,—ইনিই সেই পরমপুরুষ, যিনি জগৎ কল্যাণে অবতীর্ণ হয়েছেন।

তারপরেই সংবাদ পেলেন। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী সিঁথিতে বাস করছেন।

দয়ানন্দ স্বামীকে দেখে ঠাকুর বললেন, খানিকটা শক্তি হয়েছে বটে, তবে কিছু একটা করব বলে মনে বড় অহংকার।

এমনি করে যেখানেই পণ্ডিত বা বিজ্ঞজনের সন্ধান পেয়েছেন সেইখানেই নির্দ্বিধায় ছুটে যেতেন ঠাকুর তাঁদের কাছে জ্ঞান আহরণ করতেন, পরখ করে দেখতেন কার কাছে কি আছে।

তাছাড়া ভক্ত'র বাড়ীতেও তিনি তেমনি করেই ছুটে যেতেন ভক্তের টানে। যেন ঠাকুরই তার একমাত্র অভিভাবক। তিনি না গেলে আর কে যাবে।

* * *

ঠাকুর বার বার তাঁর ভক্তদের বোঝালেন ঈশ্বর এক ও অভিন্ন। যে কোন পথেই যাও। প্রাণে আকুলতা থাকলে তাঁকে নিশ্চয়ই পাবে।

প্রেমই একমাত্র পথ যে পথে অল্পকালেই পথের সকল বাধা-বিপত্তি দূর হয়ে যায়। ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা না ভেবে তোমরা সর্বদা সদাচারে থাকো, তা হলেই একদিন সত্যের আলো দেখতে পাবে।

সারা বিশ্বময় তিনি অবতার বলে প্রমাণিত, পূজিত।

সকল ধর্মের সার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

তিনি নিজে বলেছেন,—সকল ঘর না ঘুরলে কি ঘুঁটি চিকেয় ওঠে।

তাই সকল সাধনাতে সিদ্ধিলাভ করে তিনি হয়েছেন মহাপুরুষ

বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন দয়া-করুণা, প্রেম আর ক্ষমা। ভক্তি আর মুক্তির পথের সন্ধান।

ভারতের প্রতি তীর্থে-তীর্থে তিনি সঞ্চয় করেছেন সাধনা। তাঁর গোচরে এসেছেন এমন প্রতিটি সাধু সন্ন্যাসী বিজ্ঞ পণ্ডিতজনের সংস্পর্শে এসেছেন তিনি। তাই মানুষের মন বিচার করতে তিনি ছিলেন সিদ্ধ। বিশ্বের সকল কিছুই তাঁর গোচরীভূত ছিল তাই যেখানেই অনিয়ম অনাস্থা দেখতেন তখনই তাকে অনায়াসে দূরীভূত করতেন।

তীর্থে ভ্রমণ করবার সময় ঠাকুর বলতেন—এতলোক যেখানে বিশ্বাস করে তপজপ ধ্যান করতে আসে সেখানে ঈশ্বর না থেকে পারেন? তুমিও বিশ্বাস রাখো দর্শন পাবে।

তিনি নিজে তার প্রমাণ দিয়েছেন। প্রতি তীর্থেই দর্শন করেছেন ঈশ্বরকে।

ঠাকুর বললেন সর্বত্র যিনি ঈশ্বর চিন্তা করেন একমাত্র তিনিই পান ঈশ্বরের সাক্ষাৎ। চিন্তা শুধু পরবর্তী অনুচিন্তা হলে চলবে না, তীর্থাভিলাষী ব্যক্তির থাকবে পূর্ববর্তী চিন্তা।

ঠাকুর কালীঘাট থেকে দর্শন করে কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে ফিরছেন। তার মধ্যে একজন ভক্ত রাস্তা থেকে আলাদা হয়ে গেল। পরদিন সেই ভক্তটিকে ডেকে বললেন ঠাকুর—কাল রাত্রে কোথায় ছিলি?

ভক্তটি বললেন,—শ্বশুর বাড়ীতে।

সে কি? মাকে দর্শন করে কোথায় তাঁর চিন্তায় বিভোর হয়ে

জাবর কাটবি। তা নয়, তুই শ্বশুরবাড়ি গেলি? দর্শন করে সেই ভাবটা প্রাণে যদি খানিকক্ষণ দাঁড়াতে না পেল তাহলে আর করলি কি?

দিন দিন ঠাকুরের অসুখটা বেড়ে উঠেছে। কাশীপুরের বাগান বাড়ীতে সকল ভক্তরা প্রাণপণ সেবা করছে। সেই সময়ে হঠাৎ বিবেকানন্দ তারক আর কালীকে নিয়ে কাউকে কিছু না বলে চলে গেলেন বুদ্ধগয়াতে।

চারিদিকে খোঁজ-খোঁজ রব পড়ে গেল। ঠাকুরের কানেও গেল সেই কথা। ঠাকুর বললেন, ওরে তার যে নাড়ী বাঁধা রয়েছে এখানে। যেখানেই যাক ফিরে এলো বলে।

নরেন সেই বোধিবৃক্ষের নিচেয় বসে ধ্যান করতে করতে সমাধিস্থ হয়ে পড়েছে।

তথাগতের ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।

যতদিন না সেই কল্লান্ত সত্য করতলগত না হবে ততদিন এইখানে একমনে বসে ধ্যান করবেন, তাতে শরীর যায় যাক, তবু প্রলয় আসুক।

ঈশ্বরের জন্যে প্রাণপাত চাই।

তাই প্রাণপাতের খোঁজে বিভোর হয়ে সমস্ত ফেলে নরেন ছুটে গেছে বোধিবৃক্ষের তলায়। সেখানে ঈশ্বর চিন্তায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে।

ব্রহ্মানন্দকে অস্থির দেখে ঠাকুর বললেন,—তার সকল ধর্ম কর্ম যে এখানে, সে যাবে কোথায়? বলে ঠাকুর নিজের শরীর দেখিয়ে দিলেন।

কালী বললো—নরেনকে নিয়ে কি বিপদ। বোধিবৃক্ষের নিচেয় ধ্যানে বসে সমাধিস্থ হয়ে পড়লো, সে ধ্যান আর ভাঙতে চায় না। বহুকষ্টে ওর ধ্যান ভাঙিয়েছি।

সেই ধ্যানে বসে নরেন ভগবান তথাগতের দর্শনলাভ করে ফিরে এসেছে প্রফুল্লচিত্তে।

ঠাকুর জানতেন নরেন বহু উচ্চমার্গের সাধক।

তাই কোনদিন তিনি নরেনকে কোনো কাজে বাধা দেন নি। প্রথম প্রথম সাকার উপাসনার কথা বলতে একেবারে হেসে উড়িয়ে দিতো! ঠাকুর তার প্রতিবাদ করেন নি। তিনি জানতেন, ওর মনে যখন প্রেমভাব পরিপূর্ণ উদয় হবে, তখন সাকার-নিরাকার সব একাকার হয়ে যাবে।

যে উদার তার কাছেই ভগবান আসেন। তবে অনেক সাধনার পর উদারভাব আসে বললেন ঠাকুর। আবার ভক্তদের সাবধান করে বললেন, অনেকে এই উদারতাকে বোকা বলবে; বলবে মূর্খ বা বোকা হসনি। সব সময় মনে মনে বিচার করবি। কোনটা সৎ কোনটা অসৎ। কোনটা গ্রহণের যোগ্য আর কোনটা ত্যাজ্য। অনিত্য থেকে নিত্যকে বেছে নিবি। পাপকে পরিহার করে পূণ্যকে বেছে নিবি। আর মায়া-মোহ বাদ দিয়ে ত্যাগ আর নিষ্কাম সাধনার পথ গ্রহণ করবি।

যোগানন্দ বড়বাজার থেকে বাড়ীর জন্য একটা কড়াই কিনে এনেছেন। দোকানদারকে বিশ্বাস করে কড়াই নিয়ে এসেছেন যোগানন্দ। দক্ষিণেশ্বরে এসে দেখলেন কড়াই ফুটো।

ঠাকুর সেই কথা শুনে বললেন, জিনিষটা আনবি তা দেখে আনবি না? সে কি কথা। ভক্ত বলে বোকা হবি নাকি? লোকে যে ঠকিয়ে নেবে। কিনবি যখন তখন ফাউটি পর্যন্ত ছাড়বি না।

কাশীতে গিয়ে সেবার মথুরবাবু দানধ্যান করছেন। এক একদিন কল্পতরু হয়ে কাপড় গামছা পর্যন্ত দান করতে লাগলেন। প্রথম দিনই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মাধুকরী দিলেন।

মাধুকরীর দিনে ব্রাহ্মণরা নিজেদের মধ্যে ভীষণ দলাদলি, ঝগড়া

শুরু করে দিল। তাই দেখে ব্যথিত হৃদয়ে ঠাকুর মা জগদম্বাকে বললেন,—মা তুই আমাকে এখানে আনালি কেন? আমি ত দক্ষিণেশ্বরেই বেশ ছিলাম।

যে কদিন কাশীতে ছিলেন, সে কয়দিন অত্যন্ত সাবধানে থাকতেন ঠাকুর। এমন কি কাশী অপবিত্র হবে ভেবে প্রতিদিন নৌকা করে কাশীর বাইরে গিয়ে শৌচাদি কাজ সেরে আসতেন।

ঠাকুর নৌকা করে বেড়াচ্ছেন। ঘুরতে ঘুরতে দূরে শ্মশান দেখতে পেয়েই আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন। অমনি নৌকার বাইরে এসে দাঁড়ালেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

সকলে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল ঠাকুরের সেই সমাধিমগ্ন মূর্তির চারিদিকে একটা উজ্জ্বল জ্যোর্তিমণ্ডল চারিদিক আলো করে আছে।

সমাধি ভাঙ্‌লে তিনি বললেন,—দেখলাম একজন ধবধবে সাদা বিরাট জটাধারী পুরুষ প্রত্যেকটি চিতার পাশে দাঁড়িয়ে শবগুলির কানে তারকব্রহ্ম নাম শোনাচ্ছেন আর তদারক করছেন, আর মা জগদম্বা একপাশে দাঁড়িয়ে মায়ার বন্ধন কাটছেন।

মৌন তপস্বী ত্রৈলঙ্গস্বামীকে ইশারায় প্রশ্ন করলেন,—ঈশ্বর এক না অনেক?

ত্রৈলঙ্গস্বামী ইশারায় বললেন, ভাবে অজ্ঞান হয়ে দেখ তিনি এক। নইলে যতক্ষণ তোমার চেতনা বহুবিভক্ত, ততক্ষণ ঈশ্বরও বহুরূপে প্রকাশিত।

ঠাকুর হৃদয়কে ডেকে বললেন,—হৃদে, একেই বলে প্রকৃত পরমহংসভাব।

কাশী থেকে বৃন্দাবন গেলেন।

বৃন্দাবনের চেয়ে ব্রজভূমির আকর্ষণ ঠাকুরকে আকৃষ্ট করলো বেশি।

নিধুবনের তপস্বিনী গঙ্গামাতা। পূর্বজন্মে গঙ্গামাতা ছিলেন ললিতা সখী। এই জন্মেও শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ধ্যানে বিভোর হয়ে আছেন।

তাঁর কাছে গিয়ে ঠাকুর ভক্তিতে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। মনে মনে ভাবলেন, বাকী জীবনটা এই পরমাসাধিকা নারীর কাছেই কাটিয়ে দেবেন। গঙ্গামাতাও ঠিক চিনতে পারলেন ঠাকুরকে প্রকৃত হীরা বলে।

মথুরবাবু চিন্তিত হয়ে পড়লেন, ভাবলেন, ঠাকুরকে বুঝি আর ফেরানো যাবে না।

এমনি সময়ে ঠাকুরের সামনে ভেসে উঠলো জননী চন্দ্রমণির মূর্তি।

চন্দ্রমণি দেবী এখনো জীবিত। তাঁকে দেখবে কে? কে তার সেবা করবে? বৃদ্ধ বয়সে তিনি বড় কষ্ট পাবেন।

সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরকে চঞ্চল করে তুললো মাতৃচিন্তা।

যে হৃদয় একমাত্র ঈশ্বর চিন্তায় নিবেদিত। সেই হৃদয় অপূর্ব মাতৃভক্তিতে উথলে উঠলো। বৃন্দাবন থেকে ফিরে গিয়ে তিনি স্বহস্তে মাতৃসেবা করেছেন।

বৃন্দাবন থেকে ফিরে এলেন কাশী।

মথুরবাবুর ইচ্ছা গয়া যাবেন। কিন্তু ঠাকুর রাজী হলেন না। এই গয়াতেই ঠাকুরের পিতৃদেব ঈশ্বর দর্শন ও দৈবাদেশ পেয়েছিলেন। পরে শিষ্যদের কাছে এই বিষয়ে ঠাকুর বলতেন, কি জানি গয়াতে গিয়ে যদি প্রাণটাকে আর ধরে রাখতে না পারি?—যদিও সেটা ছিল একরকম অসম্ভব।

শুধুমাত্র মানবকল্যাণের জন্য তিনি তাঁর ইচ্ছামৃত্যু বরের কথা কখনো প্রকাশ করেননি।

ঠাকুরের মানস সন্তান বিবেকানন্দেরও ছিল সেই অসীম শক্তি, তা জানতেন ঠাকুর, তাই বলতেন, নরেন যেদিন জানতে পারবে ও কে, সেদিন আর দেহ রাখবে না।

জগৎ উদ্ধারের জন্য তিনি নিজের সুখ সুবিধা তো দূরের কথা, প্রাণের মায়াটুকুও করেন নি কখনো। এইখানেই তিনি সাধারণ মানুষ

থেকে আলাদা। পৃথিবীতে যখনই ধর্ম বিপন্ন হয়েছে তখনই নব নবরূপে ঈশ্বর অবতীর্ণ হয়ে বিপন্নকে রক্ষা করছেন ও ধর্মসংস্থাপন করেছেন।

সেই সময়ে তাঁদের আরব্ধ কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাঁচার আকাঙ্ক্ষা দেখান। কিন্তু তাঁর কাজটি শেষ হলে মুহূর্ত অপেক্ষা করেন না। ফিরে যান সেই অনন্তলোকে।

ভ্রমণ শেষে সকলে এলেন কলকাতায়।

তাঁর কিছুদিন পর শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাভূমি নবদ্বীপ দেখতে গেলেন। সঙ্গে গেলেন মথুরবাবু।

শ্রীচৈতন্যকে ঠাকুর অবতার বলে মানতেন না। কোন শাস্ত্রে গ্রন্থে লেখা নেই তাঁর কথা।

নবদ্বীপ বেড়িয়ে হতাশমনে ফিরছেন ঠাকুর। দর্শন হল না। নৌকায় উঠেছেন, এমন সময়ে দেখতে পেলেন আকাশপথে দু'টি কিশোর বালক ঠাকুরের দিকে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের চারিদিকে জ্যোর্তিমণ্ডল ঘিরে রয়েছে।

চীৎকার করে উঠলেন ঠাকুর। নবদ্বীপ আসা সার্থক হলো। সঙ্গে সঙ্গে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। এবার আর শ্রীচৈতন্যর অবতার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রইলো না।

* * *

কলুটোলায় হরিসভা বসেছে। ঠাকুরকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সদস্যরা। ঠাকুর গেলেন হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে।

হরিসভার সদস্যরা নিজেদের শ্রীচৈতন্যদেবের পদাশ্রিত বলে মনে করতেন। সেইজন্যে হরিসভার মধ্যে সব সময়েই মহাপ্রভুর জন্যে একটা আসন পাতা থাকতো। সেই আসনের সামনে মহাপ্রভুকে কল্পনা করে পূজা পাঠ প্রভৃতি চলতো।

ঠাকুর এসে দেখেন সামনে শূন্য আসন। ভক্তরা সেই আসনকে লক্ষ্য করে ভগবৎ পাঠ শোনাচ্ছেন। ঠাকুরও তন্ময় হয়ে সেই পাঠ

শুনছেন। হঠাৎ ছুটে গিয়ে দাঁড়ালেন আসনটির উপর, তারপরেই ভাবমগ্ন হয়ে পড়লেন।

শ্রোতারা বিস্মিত। পাঠক স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন ঠাকুরের সেই মূর্তির দিকে। ঠাকুরের চারিদিকে একটা জ্যোর্তিমণ্ডল ঘিরে রয়েছে। তারপর আবার সংকীর্ত্তনের সঙ্গে নাচতে লাগলেন। উপস্থিত সকলের সঙ্গে যেন মিশে গেলেন তিনি।

সংকীর্ত্তন শেষে ঠাকুর ফিরে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে।

কিন্তু হরিসভায় এই ব্যাপার নিয়ে তর্কের শুরু হলো। ঠাকুরের এই আচরণকে একদল মেনে নিল। অন্যদল ক্ষুব্ধ হলো। তারা বললো, অনামী রামকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যের শূন্য আসনে দাঁড়িয়ে কাজ ভালো করেনি।

কথাটা ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। কিন্তু ঠাকুর এসবের বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানেন না।

অবশেষে ভগবানদাস বাবাজী কথাটি শুনে বিচলিত হলেন। যে ভগবানদাস বাবাজীর মুখ থেকে অবিরত প্রেমের বাণী উচ্চারিত হয়, এই কথা শুনে তিনি নানা কটুকথা বলতে দ্বিধা করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিলেন ভবিষ্যতে যাতে আর এমন না হয়।

এরই কয়েকদিন পর ঠাকুরের ইচ্ছা হলো ভক্তপ্রবর ভগবান-দাসকে দেখবার জন্য। সেইদিনই হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে কালনায় গিয়ে পৌঁছলেন। আর সঙ্গে গেলেন মথুরবাবু।

আশ্রমের কাছে এসে ঠাকুর অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়লেন।

ভগবানদাস বাবাজী সেই সময় কাউকে যেন বলছিলেন, আশ্রমে কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে।

বাবাজীর সামনে ঠাকুর লজ্জায় নত। দীনভাব। হৃদয় পরিচয় করিয়ে বললেন,—আমার মামার খুব ইচ্ছে আপনাকে দেখবার তাই এসেছেন। উনি ঈশ্বরের নামে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েন।

ভগবানদাস বাবাজী ভালো করে লক্ষ্য করে কথা বলতে লাগলেন। কিন্তু সেই কথার মধ্যে তিনি আবার মালা জপ করছেন। তাই দেখে হৃদয় বলে উঠলেন। একি, আপনি তো সাধনায় সিদ্ধ হয়েছেন, তা এখনো মালা রেখেছেন কেন?

হৃদয়ের প্রশ্ন শুনে হঠাৎ হতচকিত বাবাজী কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, লোকশিক্ষার জন্যে এর প্রয়োজন আছে, নইলে যে তারা ভ্রষ্ট হবে।

ঠাকুর আশ্রমে ঢুকবার আগে কোন একজন ভক্তকে বাবাজী তিরস্কার করে বলছিলেন তার কণ্ঠী ছিঁড়ে নিয়ে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দেবেন। সেই কথাটি শোনা অবধি ঠাকুর মনে মনে বিষণ্ণ। তিনি লক্ষ্য করলেন এখানে সর্বত্র আমিত্বের ব্যবহার!

ঠাকুর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—এখনো তোমার এত অহঙ্কার? তুমি কে লোকশিক্ষা দেবার? তুমি কে তাড়িয়ে দেবার? যাঁর জগৎ তিনি না দেখালে তোমার ক্ষমতা কি শেখাবার, দেখাবার?

ঠাকুরের মন তখন অপ্রসন্নতায় তিক্ত। লজ্জা পরিণত হয়েছে বিরক্তিতে! বলতে বলতে দীপ্তিময় হয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

বাবাজী স্তব্ধ হয়ে দেখছেন। আজ পর্যন্ত তাঁর সামনে এমন কথা কেউ কোনদিন বলেনি। এবার অবশ্য তাঁর রাগ হলো না।

তিনি ভাবলেন, সত্যিই তো যাঁর কাজ তিনি না করলে আমি করবার কে? সে ক্ষমতা কোথায় আমার! তিনি দেখলেন তাঁরই সামনে দাঁড়িয়ে এক অদ্বিতীয়পুরুষ।

ক্রমে বাবাজীর হৃদয়ে শ্রদ্ধা জাগলো। লজ্জায় অবনত হয়ে কথা বলতে লাগলেন ঠাকুরের সঙ্গে।

পরে যখন শুনলেন, ইনিই সেই রামকৃষ্ণ, যিনি কলুটোলার হরিসভায় শ্রীচৈতন্যর আসন অধিকার করেছিলেন। তখন আরো বেশি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন ভগবানদাস বাবাজী।

ঠাকুর জানেন শাস্ত্রের বচন সত্য। কিন্তু সাধারণ মানুষ সেই সত্যকে উপলব্ধি করতে অক্ষম বলেই শাস্ত্র অসাড় হয়ে আছে তাদের কাছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেই সব অজ্ঞান মানুষকে শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য ও তত্ব জলের মত সহজ সরল করে বোঝাবার জন্যেই যেন আবির্ভূত হয়েছেন।

এই বোঝাবার ভারটুকুই তাঁর গুরুগিরি।

মেয়েরা যেমন হাঁড়ির একটা ভাত টিপে সমস্ত হাঁড়ির ভাতের অবস্থা জানতে পারে, তেমনি জগৎ নিত্য কি অনিত্য তার দু'একটা জিনিষ পরখ করলেই জানতে পারা যায়। এইভাবে যখন বুঝতে পারবে জগৎ অনিত্য তখন আর তাকে ভালবাসতে পারবে না। মনের মধ্যে তখন ত্যাগ এসে বাসা বাঁধবে। ত্যাগ একবার আশ্রয় করতে পারলেই জানবে ঈশ্বর দর্শন হবেই। এমনি করে যার দর্শন হয় সেই তো সার্থক।

বলরাম বসুর বাড়িতে নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেক ভক্তের সঙ্গে ঠাকুর আলাপ আলোচনা করছেন। কথায় কথায় কথা উঠলো অনুবীক্ষণ যন্ত্রের। ঠাকুরের সখ হলো যন্ত্রটা দেখবার জন্য। একজন গিয়ে যন্ত্রটা নিয়ে এলো।

যন্ত্র এলো কিন্তু ঠাকুরের দেখা হলো না। তিনি বললেন,—নাঃ, মনটা এখন এত উঁচুতে উঠেছে যে তাকে নামাতে পারছি না। অর্থাৎ দেহের প্রভাব ছাড়িয়ে তাঁর দর্শনেন্দ্রিয় উর্ধলোকে বিচরণ করছে। তখন কেবলমাত্র অন্তরের চোখ দু'টো খোলা রয়েছে। বাইরের চোখের দৃষ্টি অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে মিশে এক হয়েছে।

ইন্দ্রিয় সকলেরই আছে, তাই বলে সকল ইন্দ্রিয় সকলের সব সময় কাজ করে না, ঠাকুরের বেলায় সকল ইন্দ্রিয়গুলি একই সঙ্গে কাজ করে। ফলে, তিনি যা কিছু দেখতেন, শুনতেন বা স্পর্শ করতেন সব

কিছুরই মধ্যে কিছু না কিছু জ্ঞান অর্জন করতেন। সেই জ্ঞানের দ্বারা অন্যের মনের ভাবনা ও মানসিক চরিত্র দূর থেকে বুঝতে পারতেন।

একদিন দক্ষিনেশ্বরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সঙ্গে কথা বলছেন ঠাকুর। এমন সময় বাগানে একটা জুড়ি গাড়ি এসে দাঁড়ালো।

গাড়িটা দেখেই ঠাকুর ঘরের মধ্যে পালিয়ে গেলেন। তারপর ব্রহ্মানন্দকে ডেকে বললেন,—ওদের বলে দে এখন দেখা হবেনা।

গাড়ি থেকে নেমে একজন এসে ব্রহ্মানন্দকে বললেন, -এখানে নাকি একজন সাধু থাকেন?

হ্যাঁ থাকেন। কি দরকার আপনার?

আমার এক আত্মীয়ের খুব অসুখ। বহু চেষ্টা করেও উপকার হচ্ছে না, তাই এলাম সাধুর কাছে, তিনি যদি একটু দয়া করেন।

ও, আপনারা বোধ হয় ভুল শুনেছেন। বললেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পঞ্চবটীতে দয়ানন্দ ব্রহ্মচারী থাকেন, তিনিই ওষুধ পত্র দিয়ে থাকেন। আপনি সেখানে যান।

সেই কথা শুনে তারা চলে গেল। তখন ঠাকুর বাইরে এসে বললেন, লোকগুলোর মধ্যে একটা তমোভাব লক্ষ্য করলাম। তাই সরে গেলাম আমি।

ব্রহ্মানন্দ সে কথার কোনো জবাব দিলেন না।

স্বামিজীর মুখে ঠাকুর বহুবার শশধর চূড়ামণির নাম শুনেছেন। খুব নামডাক তাঁর। অনেক লোকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে। একদিন ঠাকুরও গেলেন তাঁকে দর্শন করতে।

আলাপ আলোচনার পর এক গ্লাস জল চাইলেন ঠাকুর। একজন লোক তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল নিয়ে এলো। সে জল ঠাকুর মুখে দিলেন না। লোকটি ভাবলো হয়তো জলে কিছু পড়েছে, তাই সেই জলটা ফেলে দিয়ে আর এক গ্লাস জল এনে দিল। সামান্য একটু খেয়ে ঠাকুর বিদায় নিলেন।

স্বামিজী ছিলেন সঙ্গে। তিনি বারবার ভালো করে লক্ষ্য করেছেন জলে কিছু পড়েনি। অথচ ঠাকুর কেন খেতে পারলেন না। স্বামিজী ভাবলেন, বোধ হয় ছোঁয়া লেগে থাকবে।

স্বামিজী জানতেন ধর্মের ভান করে যারা, মনে মনে যাদের আসক্তি পরিপূর্ণ, ঠাকুর তাঁদের ছোঁয়া জিনিষ ছুঁতে পারেন না।

আসল ব্যাপারটা না জানলে চলে না। স্বামিজী ঠাকুরকে গাড়িতে তুলে দিয়ে নিজে ফিরে এলেন যে লোকটি জল দিয়েছিল তার ছোট ভাইয়ের কাছে। তার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন বড় ভাইয়ের সম্বন্ধে।

আশ্চর্য ব্যাপার। স্বামিজী যা সন্দেহ করেছিলেন ঠিক তাই।

ঠাকুরের মানসিক গঠন এমন মুক্ত স্বভাব ছিল যে যখন খুশী যে কোনো জিনিষকে গ্রহণ বা বর্জন করতে পারতেন।

বিবাদ, সংশয় আর অহংকার কোনদিন ঠাকুরকে স্পর্শ করতে পারেনি।

*   *   *   *

ঠাকুর দেখলেন শ্রীচৈতন্যের পর বাংলাদেশে বৈষ্ণব আর শাক্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে অহরহ বিবাদ লেগে রয়েছে। তিনি নিজে উভয় পথে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করলেন। সমন্বয় করলেন দুয়ের মধ্যে।

বাংলাদেশের অসাধারণ বাগ্মী প্রতিভা কেশবচন্দ্র সেন। ভারতবর্ষ এবং ভারতের বাইরেও তাঁর বক্তৃতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের লোক তাঁকে বলেন ব্রহ্মানন্দ। তিনি ঈশ্বরের দর্শন পান। এই কথা শুনে ঠাকুর গেলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

একদিন সকালবেলা হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে বেলঘরিয়ার বাগান-বাড়ীতে গিয়ে হাজির। কেশবচন্দ্র তাঁর ভক্তদের নিয়ে আলোচনা করছিলেন। ঠাকুর অতি দীনভাবে গিয়ে বসলেন সেখানে। নম্রভাবে প্রশ্ন করলেন ঠাকুর,—বাবু! তোমরা নাকি ঈশ্বরের দর্শন পাও? তা দর্শনটা কেমন আমি একটু জানতে এসেছি।

বলতে বলতে গান ধরলেন ঠাকুর। কে জানে কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় দরশন, তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন—ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।

গান শেষ হতেই সমাধিমগ্ন হয়ে পড়লেন ঠাকুর। অবাক বিস্ময়ে সকলে তাকিয়ে আছেন ঠাকুরের দিকে। তাঁর চোখ দিয়ে জল ঝরছে, মুখে হাসি। তেমনি আবিষ্টভাবেই বলতে লাগলেন—ঈশ্বরের ভাব অনন্ত। তিনিই সাকার আবার তিনিই নিরাকার। যে যেমন ভাবে দেখতে চায় সে তেমনি দেখতে পায়।

একটা গাছে একটি গিরগিটি থাকতো। একজন তাকে দেখে এসে বললো, ওটার রং লাল, অন্যজন দেখে বলল সবুজ, আর একজন বললে হলুদ বরন, কেউ আবার বললো নীল। এই নিয়ে দর্শকদের মধ্যে লাগলো মহাতর্ক। সেই গাছতলায় থাকতো একজন ওদের তর্ক শুনে সে বললো—ওহে, তোমাদের সকলের কথাই ঠিক। আসলে গিরগিটিটা বহুরূপী। ক্ষণে ক্ষণে সে রং পাল্টাবার ক্ষমতা রাখে। তাই তাকে যে যেমন দেখেছ তেমনিই বলেছ।

এটা হলো সেই অন্ধদের হাতী দেখার মতো।

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সামান্য একটু অংশ দেখেই মানুষ ঝগড়া করে মরে। আসলে শক্তি না জাগলে ব্রহ্ম জানবার উপায় নেই। অথচ এই দুয়ে অভেদ আছে, যেমন আগুন আর দাহিকাশক্তি। একটা ছেড়ে আর একটা ভাবা যায় না। সূর্যের উত্তাপ ছেড়ে সূর্যকে কেউ ভাবে?

কেশবচন্দ্র অবাক হয়ে শুনে যাচ্ছেন।

ঠাকুর বললেন, সোনার আতা দেখেছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বললেন কেশব।

সোনার আতাটি দেখলে যেমন গাছের আসল আতাটির কথা মনে পড়ে, তেমনি মাটির মা কালীকে দেখলেও আসল সেই আনন্দময়ী জগদম্বাকেই মনে হয়।

কেশবচন্দ্র অবাক হয়ে স্বীকার করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বর জানা মহাপুরুষ। দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের খুব অন্তরঙ্গতা হয় এবং প্রায়ই তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসতেন।

একদিন এক ভক্তকে ডেকে বললেন,—ওরে আমাকে একবার বিদ্যাসাগরের কাছে নিয়ে যেতে পারিস? তাকে দেখতে বড় সাধ হয়। দশজনে যাকে মানে-গুণে, সেইখানেই ভক্তির অধিক বিকাশ। সেইখানেই তো ঈশ্বরের পরম কৃপা।

সেই কথা শুনে বিদ্যাসাগর খুব খুশী হলেন। ঠাকুরের আসবার দিন তিনি পথ চেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। বিদ্যাসাগর ভেবেছিলেন, নিশ্চই গেরুয়া পরা কমণ্ডলুধারী কোনো পরমহংস আসছেন। কিন্তু গাড়ি থেকে নামলেন সাধারণ লাল পেড়ে ধুতি পরা, পায়ে বার্নিশ করা চটি আর জামা গায়ে একজন সাধারণ মানুষ।

বিদ্যাসাগর পরমভক্তিভরে অভ্যর্থনা জানালেন ঠাকুরকে। ঠাকুরও তৃপ্তিভরে ঘরে এসে বললেন,—এতদিন খাল, বিল, নদীতে ছিলাম, এবারে সাগরে এলাম।

বিদ্যাসাগরও হেসে বললেন,—বেশ তো, তাহলে সাগরের লোনাজল খানিকটা নিয়ে যান।

তা কেন গো; তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও যে নোনাজল হবে? তুমি যে বিদ্যাসাগর, অর্থাৎ ক্ষীর সমুদ্র!

বিদ্যাসাগর বিনীতভাবে বললেন,—আপনি যখন বলছেন তখন তাই হবে।

ঠাকুর বললেন,—এই জগতে বিদ্যামায়া আর অবিদ্যামায়া দুইই আছে, মন্দ-ভালো, মত-অমত সব দুই, কিন্তু ব্রহ্ম এক, সূর্য একটাই আলো দিচ্ছে। তার বেলায় শিষ্ট-অশিষ্ট বাছ-বিচার নেই। সকলকেই সমানভাবে আলো দিচ্ছে। ব্রহ্ম নির্বিকার। তবে যদি বলো,

পাপ, তাপ, শোক, হিংসা, দ্বেষ, এসব তবে কি। ওসব জীবের পক্ষে। ব্রহ্ম যে কি তা মুখে বলা যায় না। বেদ, পুরাণ দর্শন সব মুখে পড়া হয়ে গেছে, মুখে মুখে উচ্চারিত হচ্ছে, তাই ওসব এঁটো হয়ে গেছে। কিন্তু ব্রহ্মা যে কি তা আজ পর্যন্ত কেউ মুখে বলতে পারেনি, তাই ব্রহ্মা উচ্ছিষ্ট হয়নি।

সেই কথা শুনে চমৎকৃত হয়ে বিদ্যাসাগর বললেন, বা, বা, আজ একটা নতুন কথা শিখলাম।

একজন প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, সমাধিযোগে যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তিনি কি আর কথা কন না?

ঠাকুর বললেন,—মৌমাছি যতক্ষণ ফুলে না বসে ততক্ষণ গুণ গুণ করে। ফুলে বসে মধু খেতে আরম্ভ করলেই চুপ হয়ে যায়। আবার কখনো কখনো মধু খেয়ে মাতাল হয়ে গুণগুণ করে। যেমন কলসীতে জল ভরবার সময়ে ভক ভক শব্দ হয়, ভরে গেলে আর হয় না। যেমন ছাদে উঠে বেশিক্ষণ থাকা যায়না, আবার নেমে আসতে হয় নিচেয়! তেমনি যতক্ষণ সমাধিস্থ হয়ে থাকবে ততক্ষণ থাকবে ঈশ্বর সমীপে। তারপর আবার নামতে হবে জীবজগতে। যেখানে ছোট, বড়, গাছ-ফুল-পাতা, ভালো, মন্দ, চন্দ্র, সূর্য সবই আছে, এক কথায় তাঁকে বিশ্বাসেই পাওয়া যায়।

এমনি করে একে একে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখতে গেলেন একদিন। মথুরবাবু মহর্ষির সহপাঠী। একসঙ্গে পড়েছেন হিন্দু কলেজে। তাই মথুরবাবুকে নিলেন সঙ্গে। মহর্ষির কাছে গিয়ে সরল বালকের মত বললেন,—তোমার গায়ের জামা খোল আমি দেখব। অবশেষে মহর্ষির গায়ের জামা খুলিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষণ মিলিয়ে দেখে বললেন,—তুমি কলির জনক! তোমার এদিক ওদিক দুদিক আছে। সংসারে থেকে ঈশ্বরে মন রেখেছ, তাই তোমাকে দেখতে এলাম কিছু ঈশ্বরের কথা শোনাও।

মহর্ষি বেদপাঠ করে শোনালেন। পরে বললেন, এই জগৎটা একটা ঝাড়ের মত।" এই জীবগুলো তার দীপ। ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর মহিমা প্রকাশ করার জন্য। ঝাড়ে দীপ না থাকলে ঝাড় অন্ধকার। ঝাড়টিকে পর্যন্ত দেখা যাবেনা।

মহর্ষির কথায় ঠাকুর পরম প্রীত হয়ে ফিরে এলেন।

আর একবার বেনেটোলায় এক ভক্তের বাড়ীতে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা। সাহিত্যসম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখে ঠাকুর বললেন —তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা হয়েছ গো?

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন,—সাহেবের জুতোর চোটে, মশাই। বঙ্কিমচন্দ্র সরকারী চাকরী করতেন, সেইদিকে কটাক্ষ করেন। সেই কথা শুনে ঠাকুর প্রাণখুলে হাসতে লাগলেন। পরে বললেন,—তা কেন গো, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতির প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন। তুমি ত দেখছি নামেও বঙ্কিম, কাজেও বঙ্কিম।

দক্ষিণেশ্বরে সেদিন কেশবচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঠাকুর বললেন,—দেখ কেশব, ভাঙ্গা চালের ফুটো দিয়ে যেমন সামান্য সামান্য আলো ঘরে প্রবেশ করে, তেমনি তোমার মধ্যে চৈতন্য সূর্যের একটু আলো আসছে মাত্র। তোমার অবিদ্যাপাশ সব এখনো যায়নি।

কেশব চুপ করে শুনতে থাকেন। ঠাকুর আবার বলেন,—কালী, কৃষ্ণ, রাম এদের রূপ কেমন জানো? যেমন সচ্চিদানন্দ সাগরের এক একটি তরঙ্গ। বুঝলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বুঝেছি।

কিন্তু তোমরা যে সাকার মানো না, তার কি?

আমরা তো মানতে চাইনি, কিন্তু আপনি ছাড়েন কই? আপনি যে মানিয়ে নিচ্ছেন।

তাহলে তুমি সাকার মূর্তিকে শুধু কাঠ মাটি খড় মনে করো কেন?

সচ্চিদানন্দ বলে জ্ঞান করো। মনে করো মহাসমুদ্র। অনন্ত জলরাশি। কোথাও কূল-কিনারা নেই। •সেই জলের মধ্যে কোথাও কোথাও বরফ জমেছে। যেখানে বেশি ঠাণ্ডা সেখানেই বরফ জমে! তেমনি ভক্তি হিমে সাকার রূপ দর্শন হয়। আবার জ্ঞান সূর্য উদয় হলে বরফ গলে যেমন জল তেমনি জলাকার হয়ে যায়।

তেমনি কালীই ব্রহ্ম আবার ব্রহ্মই কালী। এককে ছেড়ে আর এককে ভাবা যায় না। যখন তিনি কিছু করেন না—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, তখন তিনি ব্রহ্ম। আবার যখন তিনি কিছু করছেন—তখন তাঁকে বলি শক্তি, কালী!

আসলে তিনি একই। নাম আর রূপের তফাৎ।

আমি তাই সব পথই ঘুরে এসেছি। সকল পথই মানি। শাক্তদেরও মানি, বৈষ্ণবদেরও মানি আবার বেদান্তবাদীদেরও মানি। তাই এখানে সকল মতের লোকের আনাগোনা। সকলেই ভাবে আমি তার দলের।

তা নইলে যে একঘেয়ে লাগবে। তা হবো কেন? অমুক, মতের লোক আমার কাছে আসবে না। অমুক মতের লোক আসবে সে ভাবনা আমার নেই। কেউ আসুক না আসুক তাতে আমার বয়ে গেছে। লোক হাতে রাখা মনোবৃত্তি আমার নেই।

ঠাকুরের প্রথম দুজন গৃহী ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত আর মনোমোহন মিত্র। প্রতি সপ্তাহেই তাঁরা আসেন ঠাকুরের সান্নিধ্যে। ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন ঠাকুরের হাতে প্রসাদ পান। একদিন ঠাকুর বললেন,—রাম, কি চাও তুমি, বলো, যা চাইবে তাই পাবে।

রামচন্দ্র চুপ করে থাকেন। কিছুই চান না। ঠাকুর আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

তখন রামচন্দ্র বললেন,—আমি আর কি চাইব। আমার কিসে কল্যাণ হবে তা তো আপনি জানেন, অতএব অপনিই বলে দিন আমি কি চাইব।

ঠাকুর বললেন—তোমার আর জপতপ করতে হবে না, কেবল এখানে এলে গেলেই হবে।

আর একদিন মনোমোহন দক্ষিণেশ্বরে আসছেন, কিন্তু বাড়ি থেকে বেরুবার সময় তাঁর পিসিমা বাধা দিলেন। কিছুতেই দক্ষিণেশ্বরে আসতে দেবেন না। মনোমোহন কারো কথা না শুনেই চলে এলেন।

দক্ষিণেশ্বরে এসে দেখলেন ঠাকুর বিমর্ষভাবে বসে আছেন। মনোমোহন কাছে এসে বসতে ঠাকুর বললেন,—একজন আমার কাছে আসতে চায়, অথচ তার পিসিমা তাকে আসতে দেবে না। তাই ভাবছি সে যদি আর না আসে।

সেই কথা শুনে মনোমোহন কেঁদে ফেললেন। ঠাকুর কি তাহলে অন্তর্যামী নারায়ণ? নইলে কেমন করে বুঝবেন তার মনের কথা? কোথায় কি হচ্ছে, কি ঘটছে কেমন করে রাখবেন সেই খবর?

যোগীন্দ্রনাথ .নামে একটি ছেলের খুব সখ হলো পরমহংসকে দেখবে। প্রায়ই সে দক্ষিণেশ্বরের আশপাশে ঘোরাঘুরি করে, কিন্তু ভেতরে যেতে সাহস পায় না।

একদিন ঠাকুর ঘরে বসে একটা লোক পাঠালেন বাইরে যারা আছে তাদের ডেকে আনতে। লোকটি বাইরে গিয়ে শুধু ছেলেটিকে দেখে তাকেই নিয়ে এলো ভিতরে।

ঘরে যারা ছিল তারা একে একে সব চলে যেতে ঠাকুর যোগীন্দ্রনাথকে কাছে টেনে এনে বললেন,—তোমার বাবাকে আমি খুব চিনতাম, তুমি এখানে আসতে লজ্জা পাও কেন? রোজ আসবে।

ছোট থাকতেই ধর্মের দিকে যোগীনের খুব মতিগতি ছিল। ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসতে আসতে সেই প্রবৃত্তিটা আরো মাথা চাড়া

দিয়ে উঠলো। যোগীন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো আর সে বিয়ে করবে না বা সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হবে না।•

কিন্তু কিছুদিন পর যোগীনের মায়ের পীড়াপিড়ীতে মাতৃভক্ত যোগীন বাধ্য হলো বিয়ে করতে।

বিয়ের পর থেকে যোগীনের দক্ষিণেশ্বরে আসা যাওয়া বন্ধ করে দিল। তার কেবলই মনে হতো, আমার প্রতিজ্ঞা আমি রাখতে পারিনি, দক্ষিণেশ্বরে গেলে ঠাকুর নিশ্চয় অসন্তুষ্ট হবেন।

মনটা কিন্তু ছট্‌ফট্ করতো যোগীনের। দেহটা কিছুতেই এগুতো না ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর কিন্তু যোগীনের কথা মোটেই ভোলেন নি প্রায়ই লোকমুখে যোগীনকে খবর দেন দেখা করবার জন্যে।

বারবার লোকের মুখে খবর পেয়ে একদিন মাথা নীচু করে ঠাকুরের সামনে এসে দাঁড়ালো যোগীন।

ঠাকুর সস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে বললেন—বে করেছিস তা কি হয়েছে, বেশ করেছিস। এই দেখ না আমিও তো বে করেছি। তাতে কি হয়েছে? এখানকার কৃপা থাকলে একটা বে তো দূরের কথা লাখটা বে করলেও কিছু হবে না।

অবাক হয়ে যোগীন তাকিয়ে রইলো ঠাকুরের মুখের দিকে। এমন কথা সে কল্পনায়ও ভাবতে পারেন নি কখনো।

এই যোগীন্দ্রনাথই একদিন স্বামী যোগানন্দ বলে পরিচিত হয়েছেন।

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ছিলেন ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত। তাঁর চেহারাটিও ছিল বৃহৎ। হঠাৎ দেখলেই তাকিয়ে থাকতে হতো।

একদিন নৌকা করে দক্ষিণেশ্বরে আসছেন নিরঞ্জনানন্দ। নৌকায় অনেক লোক। একদল লোক তাদের মধ্যে রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে নানা কেচ্ছার কথা, নিন্দার কথা বলছে ফলাও করে। সেই কথা কানে যেতে নিরঞ্জনানন্দ তাদের নিষেধ করলেন। কিন্তু তারা দলে ভারী দেখে সে কথা কানে নিল না। আরো বেশি করে বলতে লাগলো।

নিরঞ্জন তখন ক্ষেপে গিয়ে রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন।

কি এতবড় স্পর্ধা? আজ তোদের সবকটাকে মাঝ গঙ্গাতেই রেখে যাবো।

নিরঞ্জনের সেই মূর্তি দেখে উপস্থিত সকলের এত ভয় পেয়ে গেল যে, সকলে হাতে পায়ে ধরে তাঁকে শান্ত করে জীবন রক্ষা পেল।

দক্ষিণেশ্বরে আসতে ঠাকুর সব কথা শুনে বললেন,—দেখ দেখি কি কাণ্ড বাধিয়েছিলি। অন্যায় করলো দু-একজন আর তুই কিনা দাঁড়ি-মাঝি সমেত নৌকাশুদ্ধ ডুবিয়ে দিতে গেলি? রাগকে কখনো প্রশয় দিতে নাই বুঝলি?

নিরঞ্জনানন্দ মাথা হেট করলেন।

আবার একই রকম ঘটনায় যোগীনকে করলেন তিরস্কার।

যোগীন ছিল অত্যন্ত সাধাসিধে সহজ মানুষটি। সেও আসছে নৌকায় করে। নৌকার মধ্যে তেমনি একজন ঠাকুরের নিন্দা করতে লাগলো।

তাই শুনে যোগীনের মনে বড় আঘাত লাগলো। মনে মনে ভাবলো লোকটি ঠাকুরের মর্ম বোঝে না তাই নিন্দা করছে।

দক্ষিণেশ্বরে এসেও সরল মনে কথাটা ঠাকুরকে বললো যোগীন। সে ভেবেছিল ঠাকুর কথাটা হেসে উড়িয়ে দিবেন, কিন্তু হলো তার বিপরীত।

ঠাকুর বলে উঠলেন,—সেকি রে? লোকটা তোর সামনে আমার নিন্দে করে গেল, আর তুই চুপ করে শুনে এলি, প্রতিবাদটাও করলি না? ধিক তোকে। ওরে, শাস্ত্রে কি বলে জানিস না? শাস্ত্রে বলে গুরু নিন্দা শোনা মহাপাপ। গুরুনিন্দাকারীকে হয় বধ করো নতুবা সে স্থান ত্যাগ করবে। আর তুই কিনা অম্লানবদনে আমার অপমান সহ্য করে চলে এলি?

এই কথা শুনে যোগানন্দ চুপ হয়ে গেল। কথাটি সরলো না তার মুখে।

এমনি করে ঠাকুরের শিক্ষার ধরণ ছিল পাত্র বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের।

রামচন্দ্র দত্ত'র বাড়ীতে চাকরী করে একটি ছেলে। রাখতুরাম। সকলে ডাকে লেটো বলে। সাধু-সন্ন্যাসীর দিকে ভীষণ টান। বাঙ্গালীর হাতের ছোঁয়া খায় না। স্বপাকে রান্না করে খায়।

একদিন মনে হলো দক্ষিণেশ্বরে সাধু দেখতে যাবে। কলকাতা থেকে হেঁটে চলে গেল দক্ষিণেশ্বরে।

ঠাকুর বারান্দায় পায়চারী করছিলেন, এমন সময় লেটো এলো সেখানে। প্রথমে বুঝতে পারেনি এই লোকটিই পরমহংস। তার ধারণা ছিল গেরুয়া পরা, জটাজুটধারী কেউকেটা একজন সাধু।

ঠাকুর আদর করে লেটোকে বসিয়ে কথাবার্ত্তা বললেন। পরে সে জানতে পারলো ইনিই সেই, যাঁর কাছে সে এত কষ্ট করে এসেছে।

বিকেলে বাড়ি ফিরবার সময় ঠাকুর বললেন,—দেখ লাটু, এবার আর হেটে যেয়ো না। আমি পয়সা দিচ্ছি, নৌকা করে নয়তো গাড়ী করে যাও।

লাটু বললো, না না আমার কাছে পয়সা আছে।

ঠাকুর বললেন,—লজ্জা করো না, আমার কাছে পয়সা আছে, নিতে দোষ নেই। লাটু পকেট বাজিয়ে শোনালো। বললো, না, সত্যিই আছে আমার কাছে।

বেশ, তাহলে আবার আসবে তো? বললেন ঠাকুর।

নিশ্চয়ই আসবো।

লাটু চলে গেল। আবার তিনদিন পর এসে হাজির বেলা তখন ঠিক দুপুর। ঠাকুর দেখেই বললেন,—কি গো, খেয়ে দেয়ে আসোনি ত? বেশ করেছ, এখানেই প্রসাদ পাও।

বলে ঠাকুর একখানা কলাপাতা এনে পেতে গঙ্গাজল দিয়ে ধুলেন,

তারপর খাবার দিলেন। তাই দেখে লাটু বললো,—আপনি কেন এত কষ্ট করছেন, আমি খাবো না।

ঠাকুর বললেন কেন খাবে না? গঙ্গাজলে রান্না মায়ের প্রসাদ খেতে দোষ কি?

না, আমি খাবো না। আপনি খান। বললো লাটু।

তা কি হয়? তুমি বসো মায়ের প্রসাদ খেলে দোষ হয় না।

তাহলে আপনি প্রসাদ করে দিন।

আশ্চর্য হলেন ঠাকুর। যে বাঙালীর ছোঁয়া খায় না, সে খাবে ঠাকুরের প্রসাদ? অগত্যা ঠাকুর নিজের পাত থেকে কিছু খেয়ে লাটুর পাতায় তুলে দিলেন। লাটু পরমানন্দে খেতে লাগলো।

তারপর বারকয়েক যাতায়াত করতে করতেই লাটু ঠাকুরের কাছে রয়ে গেল। ঠাকুরের সেবাতেই সে নিজেকে বিলিয়ে দিল। ঠাকুরই তার যথাসর্বস্ব।

লাটু লেখাপড়া জানে না। ঠাকুরের ইচ্ছে হলো লাটুকে লেখাপড়া শেখাবেন।

একজন ভক্তকে ডেকে বললেন, একটা বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ আনো তো। লেটোকে আমি পড়াবো। শেষকালে কি আমার মূখ্যু হয়ে থাকবে?

প্রথম ভাগ এলো। ঠাকুর অক্ষর পরিচয় করিয়ে দেখিয়ে বললেন,—বল 'ক'—

লেটো বলে—'কা'। ঠাকুর বলেন—বল 'খ'। লেটো বলে—'খা'।

ঠাকুর বললেন—ওরে কা খা নয়, কখ। লেটো ততই বলে কা খা।

অবশেষে ঠাকুর বললে—যাঃ তোর আর হবে না।

তারপর যেই আসে ঠাকুর তাকেই শোনান লেটোর কথা। খুব হাসাহাসি হয় এই নিয়ে।

পরবর্তীকালে এই নিরক্ষর মূর্খলেটো স্বামী অদ্ভুতানন্দ নামে সকলের পূজো পেয়েছেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত সৃষ্টি এই অদ্ভুতানন্দ।

দক্ষিণেশ্বরের দুই তিন মাইল দূরে কামারহাটির কাছে থাকেন অঘোরমণি। ছেলেমেয়ে কেউ নেই তাঁর। খুব ভক্তিমতী। থাকেন এক ঠাকুরবাড়ীতে। উপাস্য দেবতা হলো গোপাল। গোপালের পূজো, গোপালের সেবা করেই দিন কাটে। কারো হাতে খান না, কারো ছোঁয়া খান না।

সেদিন দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরকে দর্শন করলেন। তারপর বাড়ী ফিরে জপ করতে বসলেন। কিন্তু জপে মন বসে না। কেবলই ঠাকুরের মুখ মনে পড়ে। মনে মনে বিরক্ত হন অঘোরমণি। এ আবার কি বিপদ, কোথাকার কে পাগলা সাধু, তার কথা বার বার মনে পড়ছে।

তারপর আর একদিন দক্ষিণেশ্বর যেতে ঠাকুর এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কই দেখি আমার জন্য কি এনেছ?

ব্রাহ্মণী অবাক। তাঁর সাধ্যমত সামান্য কিছু সন্দেশ এনেছিলেন, ঠাকুর খুশী হয়ে তাই খেলেন। খেয়ে বললেন,—আমার জন্য পয়সা খরচা করে রোজ রোজ সন্দেশ আনতে হবে না। নারকেল নাড়ু করে রাখবে, যখন আসবে তারই গোটা কয়েক এনো। যদি অসুবিধে হয় তো তুমি নিজের হাতে যা রাঁধো—লাউশাক চচ্চড়ি, আলু বেগুন বড়ি দিয়ে সজনে খাড়ার তরকারি, তাই এনো। তোমার হাতের রান্না খেতে খুব ভালো লাগে।

আশ্চর্য হলেন ব্রাহ্মণী ঠাকুরের আব্দারের কথা শুনে।

অবশ্য একদিন তাঁকে সত্যি সত্যি ডাঁটা চচ্চড়ি হাতে করে আসতে হলো। ঠাকুর সেই রান্না খেয়ে ভারী খুশী। বললেন, এমন চমৎকার রান্না কখনো খাইনি।

ব্রাহ্মণীর চোখ জলে ভরে আসে। তাঁর মনে হতে লাগলো, তিনি বুঝি তাঁর উপাস্য-দেবতা গোপালেরই সেবা করছেন।

ক্রমে ক্রমে ঠাকুরই হলেন অঘোরমণির গোপাল। তাঁকে সবাই তখন গোপালের মা বলে ডাকে।

ঠাকুর বলেন, গোপালের মা, তুমি এখনো এত জপ করো কেন?

জপ করবো না কেন? আমার কি সব হয়েছে?

হ্যাঁ, সব হয়েছে।

কি হয়েছে বলো।

ঠাকুর বলেন,—পূজোর চেয়ে জপ বড়ো, জপের চেয়ে ধ্যান বড়ো, ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়ো। ভাবের বড়ো মহাভাব—তার নাম প্রেম।

গোপালের মা সেইদিনই মালা থলি গঙ্গায় ফেলে দিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথ প্রথমদিকে একদিন ঠাকুরের কাছে বসে তর্ক করছেন।

ঠাকুর বলছেন জগৎ ব্রহ্মময়।

নরেন বলে তা কেমন করে হবে, তাহলে এই ঘটি, বাটি, গাছ, পাথর সবই ঈশ্বর? সবই আপনার ব্রহ্ম?

হাসতে হাসতে ঠাকুর নরেনের গা ছুঁয়ে দিলেন। অমনি নরেনের দৃষ্টি পাল্টে গেল। চারিদিকে যা কিছু দৃষ্টি গোচর হচ্ছে। সবই যে ঠাকুরের প্রতিমূর্তি। সেদিন এই অদ্ভুত ব্যাপার ভাবতে ভাবতে ফিরে এলো নরেন।

ঠাকুর বলেন, দুখানা বই পই পড়ে মনে করিস না সব শিখে ফেলেছিস। আগে সব দেখ বোঝ তবে ঐ কথা ভাব।

বই, শাস্ত্র, এসব শুধু ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার পথ বলে দেয় বড়জোর। পথটি জানা হয়ে গেল আর বই পুঁথির দরকার কি?

তখন নিজেকেই কাজ করতে হয়। তবে একটা কথা হচ্ছে পড়ার চেয়ে শোনা ভালো শোনার চেয়ে দেখা ভালো।

বিদ্যার অহঙ্কার করে যারা, যারা জ্ঞান আর পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার করে তারা সব কুয়োর ব্যাঙ। যার যতটুকু পুঁজি, তাই নিয়ে বড়াই, যার যেমন দর তাই দিয়েই মূল্য কষে পৃথিবীর অমূল্য রত্নের।

এক ভদ্রলোক তার চাকরকে বললে, 'এই হীরেটি নিয়ে দর যাচাই করে আয়। প্রথমে বেগুন ওয়ালার কাছে যা। সে কি দর দেয় আমাকে বলবি।' চাকর বেগুনওয়ালার কাছে গেল। সে হীরেটি নেড়ে-চেড়ে দেখে বললে, "আমি এর দামে ন'সের বেগুন দিতে পারি।" চাকরটি বললে, এত কম! আর একটু ওঠ, না হয় দশ সের দাও।' বেগুনওয়ালা বললে,—'আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী বলে ফেলেছি। এতে পোষায় তো দিয়ে যাও।' চাকর তখন বাবুকে গিয়ে বললে, 'মশাই' বেগুনওয়ালা তো ন'সেরের বেশী বেগুন দিতে চায় না, এর দামে।'

বাবু বললেন 'এবার কাপড়ওয়ালার কাছে যা। কাপড়ওয়ালার পুঁজি কিছু বেশী, দেখ সে কি বলে।' চাকরটি কাপড়ওয়ালার গিয়ে হীরেটি দেখিয়ে বলল,—'ওহে এটি নেবে? কত দাম দিতে পার? কাপড়ওয়ালা নেড়ে চেড়ে দেখে বলল,—হ্যাঁ জিনিসটা ভাল বটে, এতে বেশ গয়না হতে পারে। তা আমি এর দরুন ন'শো টাকা দাম দিতে পারি।' চাকরটি বললেন,—'আর একটু ওঠ, না হয় হাজার টাকা দাও।' কাপড়ওয়ালা বললে,—'এর বেশী এক পয়সা নয়। আমি বেশী বলে ফেলেছি বাজার দরের চেয়ে।' চাকর হীরেটি ফিরিয়ে নিয়ে বাবুকে গিয়ে সব কথা বললে।

বাবু হাসতে হাসতে বললেন,—'আচ্ছা এবার জহুরীর কাছে যা। সেকি বলে দেখ্।' চাকর হীরেটিকে নিয়ে জহুরীকে দেখালে। জহুরী একটু দেখেই একেবারে বললে,—এর দাম আমি লাখ টাকা দেবো।"

ঠাকুর বললেন,—"যে বিদ্যা লাভ করলে তাঁকে জানা যায়, সেই-ই বিদ্যা। আর সব মিছে। তিনি আছেন জগৎ দেখলে বোঝা যায়। কিন্তু তাঁর বিষয়ে শোনা এক, তাঁকে দেখা এক, তাঁর সঙ্গে আলাপ করা আর এক। কেউ দুধের কথা শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ বা দুধ খেয়েছে। দেখলে তবে ত আনন্দ হবে, খেলে তবে ত বল হবে, দেহ পুষ্ট হবে! তাঁকে দর্শন করলে তবে ত শান্তি হবে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করলে তবেই ত আনন্দ হবে, শক্তি বাড়বে।"

মনঃসংযোগ কি রকম হওয়া দরকার, তার চমৎকার দৃষ্টান্ত তাঁর উপদেশের মধ্যে আছে।

এক ব্যাধ পাখী মারবার জন্য নিশানা করছে। এমন সময় সেখান দিয়ে কতরকমের বাজনা বাজাতে বাজাতে কত জৌলুস করে বর ও বরযাত্রী কতক্ষণ ধরে চলে গেল। ব্যাধের কিন্তু কোন হুঁস নেই।

তাঁর এইসব উপদেশ শুধু যে ধর্ম-পথের সহায়ক। তা নয়, জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে এই সকল কথা উপকারে আসবে।

তিনি বলতেন সাহসের কথা। উৎসাহ দিতেন, নির্ভীক হোতে বলতেন। বলতেন, "ওরে ভয় নেই নিজেকে 'অধার্মিক', 'পাপী', এ সব বলতে নেই। আমি মুক্তপুরুষ, সংসারে থাকি বা অরণ্যেই থাকি, আমার আবার বন্ধন কি? আমি রাজাধিরাজের সন্তান, আমায় আবার বাঁধে কে? 'আমি বদ্ধ নই', 'আমি মুক্ত' এই কথা রোক্ করে বলতে হবে। বলতে বলতে তাই হয়ে যায়। মুক্তই হয়ে যায়।

"ঈশ্বর এক বই দুই নাই। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। তিনি একই—কেবল নামে তফাৎ। কেউ বলেছে গড্, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে ব্রহ্ম, কেউ বলছে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, যীশু, দুর্গা। এই রকম তাঁর হাজার নাম। বস্তু এক, নাম আলাদা। সকলেই এক জিনিষকে চাইছে।"

তিনি যে সমন্বয়ের বাণী শুনিয়েছেন, সেটি কি? সেটি হোল

স্বাধীনতার বাণী। তুমি হিন্দু হও, মুসলমান হও, খ্রীষ্টান হও—যে-ই হও তুমি স্বাধীন। 'চল্ তুই আপন মতে', 'বেছে নে তুই আপন পথ' কারো তুই বাধ্য নস্' এই স্বাধীনতার বাণীই তিনিই ঘোষণা করেছেন। তিনি সব ধর্মের, সব জাতের, সব মতের লোককে প্রেমের সঙ্গে কোল দিয়েছেন আর অভয় দিয়ে বলেছেন "কেউ কারো চেয়ে ছোট নয়, সব মানুষই সমান, সকলের বেঁচে থাকবার সমান অধিকার। সকলেরই ভেতরে শক্তি আছে, সেই শক্তি জাগ্রত করো, সাহসী হও, নির্ভীক হও।" কথাগুলিকে "কথামৃত" বলি কেন? কেন না, এই বিশ্ব-সংসারের নরনারীকে বাঁচিয়ে রাখতে, বাড়িয়ে তুলতে, আর উন্নতির পথ দেখিয়ে দিতে তাঁর ছোট ছোট কথাগুলির ক্ষমতা অসীম। জীবনকে বিপুল বিরাট করে তুলতে তা অমৃতের মতো বলকারী।

তাঁর 'কথামৃত' থেকে প্রত্যেক মানুষ নিজের ব্যক্তিত্ব ও জীবন গড়ে তোলবার খোরাক পায়। রামকৃষ্ণ বাণীর বিশেষত্ব। অনাবশ্যক সংস্কারের জালে জড়িয়ে না থেকে আপন চিত্তের মুক্তি কোন্ মানুষ না চায়? আপন জীবনের পরিপূর্ণতা, আপনার শক্তির জয় জয়কার কে না চায়? শ্রীরামকৃষ্ণের সোজা সহজ ছোট ছোট বাণীগুলি সব দেশের সব মানুষের পক্ষেই ব্যক্তি-স্বাধীনতা লাভের মূলমন্ত্র। এ মন্ত্র তাঁর আগে আর কেউ মানুষের সমাজে এমন কোরে বিতরণ করতে পারেন নি। তাঁর বাণী ও উপদেশ পৃথিবীর সব বড় বড় ভাষাতে ছাপা হয়েছে।

দক্ষিণেশ্বরে যেন আনন্দ-মেলা। নরেন, রাখাল, তারক, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন, শরৎ, শশী এই রকম তরুণ ভক্তের দল ঠাকুরের কাছে মহা আনন্দে মাতামাতি করেন। আর ঠাকুরেরও এঁদের পেয়ে আনন্দের আর সীমা নাই।

তাঁর মনের সাধ মিটেছে। যাদের পাবার জন্য তিনি তখন অধীর হয়ে থাকতেন "তোরা সব কে কোথায় আছিস আয় রে" বলে আকুল

হয়ে ডাকতেন, তাঁরা সবাই এখন এসেছেন তাঁর কাছে। শুধু কেবল আসা নয়, তার আপন জন হয়ে গেছেন সবাই।

তরুণ ভক্তেরা যখন-তখন এসে জড়ো হন দক্ষিণেশ্বরে। তাঁরা উপদেশও শোনেন, আবার বাগানে ঘুরে ফিরে সবাই মিলে হৈ-হল্লা, আনন্দও করেন। নরেন্দ্রনাথ এ সব দিকেই অগ্রণী।

ঠাকুর যে শুধু এঁদের ধর্মগুরু ছিলেন তাই নন, তিনি এদের লোক শিক্ষাও দিতেন। ঠাকুরের নিজের এদিকে কোন কিছুরই ঠিক থাকে না, অথচ আবার একটু এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই ঘরের জিনিসপত্তর অগোছালো থাকবার উপায় নেই। ছেলেদের কারো কোন ত্রুটি হ'লে সঙ্গে সঙ্গে শুধরে দিতেন।

যোগানন্দ বিহ্বল, নরেন বিগলিত। এমনি সকল ভক্ত মুগ্ধ বিস্মিত।

তবুও ঠাকুর পরীক্ষা করছেন সকলকে, আবার ঠাকুরকে পরীক্ষা করছে সকলে।

সেদিন রাত্রে যোগানন্দ বাড়ী যাননি। অনেক রাত পর্যন্ত ভগবানের আলোচনায় কেটেছে। ঠাকুরের অনুরোধে থাকতে হলো।

অনেক রাত্রে যোগানন্দ ঘুম থেকে উঠে দেখে পাশে ঠাকুর নেই।

চমকে উঠে এদিক ওদিক তাকিয়ে কোথাও দৃষ্টিগোচর হলো না। তখন যোগানন্দের মনে সন্দেহের ছায়া নেমে এলো।

ঠাকুর কি তাহলে নহবৎ ঘরে শ্রীমায়ের কাছে যান এমনি করে করে ?

যোগানন্দ নবত ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। দেখতে হবে কখন ঠাকুর বাইরে আসেন।

এমন সময় পঞ্চবটির দিক থেকে ঠাকুরের চটির শব্দ আসতে

যোগানন্দ আর পালাতে পারে না। ঠাকুর এসে দাঁড়ালেন যোগানন্দের সামনে।

ভক্তের দিকে দিকে চেয়ে অন্তর্যামী সবই বুঝতে পারেন। ধন্যবাদ দিলেন তারা কঠিন লক্ষ্যের জন্য। বললেন,—বেশ বেশ, সাধুকে দিনেও যেমন দেখবি, রাতেও তেমনি দেখবি। তবেই তো বিশ্বাস করতে পারবি।

নরেনকেও শেষ পরীক্ষা করলেন।

পঞ্চবটিতে ডেকে নিয়ে পাশে বসালেন নরেনকে। তারপর বললেন দেখ, আমি সাধনা করে অনেক অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়েছি। সেগুলি তুই নিয়ে নে।

নরেন বললেন, ওতে ঈশ্বর দর্শনে সহায়তা হবে?

ঠাকুর বললেন, না। তবে ইচ্ছে মত অনেক অলৌকিক কাজ করতে পারবি।

তবে ও বিদ্যে আপনারই থাক। আমার দরকার নেই। আগে ঈশ্বরলাভ হোক, তারপর ভেবে দেখব ওসব।

এমনি করে চলতে থাকে গুরুশিষ্যের পরীক্ষার পালা।

তাই একদিন নিজেকে দেখিয়ে ঠাকুর বললেন,—এই শরীরে আছে স্ত্রীলোকের মত ভাবের প্রকাশ। আর নরেনের শরীরে আছে পুরুষোচিত ভাবের প্রকাশ।

এমন কি গুরুবাক্যও পরীক্ষা করে নিঃসন্দেহ না হলে তিনি তা প্রয়োগ করেন নি কখনো।

প্রেমীভক্ত বাবুরাম একদিন ঠাকুরের কাছে আবদার করে বললেন যে তাঁর সমাধি অবস্থা যাতে আসে সেই ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

নরেন্দ্রনাথের তো আবদারের শেষ নেই। ঠাকুরের তিনি প্রিয় পাত্র। নরেন একদিন ঠাকুরকে ধরে বসলেন, "আমার এমন

অবস্থা করে দিন, যেন দিনরাত শুধু সমাধির আনন্দেই থাকি।”

ঠাকুর পাঁচ বছরের ছেলেরও এই সকল ব্রহ্মচারী ভক্তদের সঙ্গে খেলাও করেন, আর নিজে যে সকল সাধনা করেছেন সে সকলও শেখান। নরেনের সম্বন্ধে তিনি একদিন বললেন, “নরেন লোক শিক্ষা দেবে।” নরেন তার জবাব দিলেন “ওসব আমি পারবো না কিন্তু!” ঠাকুর বললেন, “পারবি না কি? তোর ঘাড় পারবে।” ঠাকুরের এই কথা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল তা আর বলতে হবে না।

এমনি করে আনন্দে দিন যায়। এইসব সংসার-বিরাগী তরুণ ভক্তদের সঙ্গে এসে যোগ দেন সংসারী ভক্তেরা, যেমন গিরিশ, রাম, সুরেন্দ্র, সুরেশ, মনোমোহন, বলরাম, দেবেন্দ্র ইত্যাদি।

দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গায় আনন্দের উজান বয়। শুধু কি এঁরাই? কত রকমের কত লোক আসে দলে দলে। নানা স্থান হতে তীর্থযাত্রী, ভক্ত, পণ্ডিত, ভাবুক, জ্ঞানী, চিন্তাশীল, ধনী, দরিদ্র, রাজা, মহারাজা, আস্তিক, নাস্তিক, ব্যবসাদার, দোকানদার, কাজের লোক, বেকার লোক, উৎসুকে দল এসে হাজির হয় দক্ষিণেশ্বরে। কেউ আসে তাঁকে দেখতে, কেউ আসে তাঁর কথা শুনতে। সকাল, সন্ধ্যা, দুপুর সব সময়েই লোক আসে। ঠাকুরের কাছে সকলেরই সমাদর। যে যা জিজ্ঞাসা করে, তার জবাব দেন। লোক আসবার বিরাম নেই, তাঁর কথারও বিরাম নেই। সর্বক্ষণ খালি কথা আলোচনা আর উপদেশ।

ক্রমশঃ ঠাকুরের শরীরে অসুখ দেখা দিল। তাঁর গলার ভেতর ঘা হলো। বোধ হয় বেশী কথা বলার দরুণই এ রকম হোল।

ঘা একটু একটু করে বাড়তে থাকে, ঠাকুরের কষ্ট হয়। তবু কিন্তু তিনি লোকের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেন না। শেষে এমন হয় যে খেতেও তাঁর কষ্ট হয়। ক্রমশঃ বেড়েই গেল তাঁর অসুখ, তখন রীতিমত চিকিৎসার দরকার হোল।

দক্ষিণেশ্বরে থেকে ভাল চিকিৎসার নানা অসুবিধা দেখে তাঁকে কলকাতায় আনা হোল। সেই যে তিনি দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে বেরুলেন আর সেখানে ফেরেন নি।

কলকাতার শ্যামপুকুরের এক বাড়ীতে তিনি থাকেন। সেখানকার একজন বড় ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর চিকিৎসা করেন। ভক্তরা মিলে দিনরাত তাঁর শুশ্রূষা করেন।

ডাক্তার এসে রোগ পরীক্ষা করে কড়া হুকুম দিলেন যে ঠাকুরের কথা কওয়া একদম বারণ। কিন্তু ঠাকুর চুপ করে থাকলে তো! সেখানেও ভক্তেরা আসেন, লোকজন আসেন, সেখানেও আনন্দের মেলা বসে যায়। ঠাকুর সকলকে নিয়ে আনন্দ করেন, উপদেশ দেন, আনন্দ যেন আরো বেড়ে ওঠে।

ঠাকুরের অসুখ কখনো বাড়ে কখনো কমে। খেতে পারেন না মোটেই, শুধু একটু একটু পায়েস খেয়ে থাকতে হয়। ভক্তদের এজন্য ভারি দুঃখ। নরেন্দ্রনাথ একদিন বললেন, "মাকে বলুন আপনার রোগ সারিয়ে দিতে। আপনি বললেই রোগ সারিয়ে দেবেন তিনি। অন্ততঃ যাতে কিছু খেতে পারেন সেটাই বলুন।

ঠাকুর চুপ করে থাকেন। ভক্তেরা পীড়াপীড়ি করেন। ঠাকুর বললেন,—তোরা তো বলছিস্ কিন্তু ও কথা যে মুখ দিয়ে বেরোয় না রে!"

ভক্তেরা বললেন, "তা হবে না, আপনাকে বলতেই হবে। আমাদের জন্য বলতে হবে।" "আচ্ছা পারি তো বলবো"—ঠাকুর

এই কথা মাকে বললেন। কিছুক্ষণ পরে ভক্তেরা জিজ্ঞাসা করলেন "বলছিলেন মাকে ? মা কি বললেন ?"

ঠাকুর বললেন, "মাকে বললুম, মা গলার দরুণ কিছু খেতে পারি না, যাতে দুটি খেতে পারি তাই করে দে। তাতে মা তোদের দেখিয়ে বললেন, কেন ? এই যে এত মুখে খাচ্ছিস ? আমি আর তখন কথাটি কইতে পারলুম না।" ভক্তেরা এই কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক্। এসব অদ্ভুত ব্যাপার কল্পনাও করতে পারে না কেউ!

মহেন্দ্র ডাক্তার কথা কইতে বারণ করেছেন ঠাকুরকে। নিজে কিন্তু ঠাকুরের মুখে কথা শোনবার লোভ সামলাতে পারেন না। যখন তিনি আসেন, ঠাকুর অনেক কথাই বলেন, আর তিনিও বসে বসে শোনেন।

আবার বললেন, "আমি যখন আসবো তখন না হয় একটু-আধটু কথা বলবেন তাতে তত ক্ষতি হবে না।" ডাক্তারের এই কথা শুনে ভক্তেরা সব হাসেন।

ডাক্তার কালীও মানেন না, অবতারও মানেন না কিছুই স্বীকার করেন না। তাঁর ইংরাজী বিজ্ঞান-শাস্ত্রে যা নেই তার বাইবের কিছু জানতে তিনি রাজী নন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে তাঁর মনের গতি ক্রমশঃ বদলে যাচ্ছে।

নরেন্দ্র সুকণ্ঠ গায়ক তাঁর গান শুনে তিনি মোহিত হয়ে যান। গিরিশ, মাষ্টারমশাই, নরেন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে কথা কইতে আরম্ভ করলে তিনি বাড়ী ফেরবার কথা ভুলে যান। একদিন গিরিশ তাঁকে বললেন, "আপনি এখানে তিন-চার ঘণ্টা রয়েছেন, কই রোগীদের চিকিৎসা করতে যাবেন না ?

ডাক্তার বললেন, "আর ডাক্তারি, আর রোগী! যে পরমহংসের পাল্লায় পড়েছি আমার সব গেল।" এই কথা শুনে সকলেই হাসতে লাগলেন।

ঠাকুর গান গাইছেন,

আমায় দে মা পাগল ক'রে।
আর কাজ নেই জ্ঞান বিচারে।

গানটি অনেকক্ষণ ধরে গাইতে লাগলেন। গানের শেষে এক অদ্ভুত দৃশ্য। সকলেই ভাবে উন্মত্ত। সকলেই উঠে দাঁড়িয়েছেন। ঠাকুরের যে অমন অসুখ তিনিও উঠে দাঁড়িয়েছেন। একেবারে ডাক্তারের সামনে। ডাক্তার নিজেও দাঁড়িয়েছেন। রোগীরও হুঁস্ নেই, ডাক্তারেরও হুঁস্ নেই, অন্য সকলের তো নেইই। সকলেই ভাবে বিভোর।

সকলেই স্থির, নিস্পন্দ। ঠাকুরের দেহের অসাধ্য রোগ তখন কোথায় চলে গেছে। ভাবের ঘোর কাটলে ডাক্তার তো অবাক্। এই পরমহংস তা হলে কে? এই ভাবে ডাক্তারও আকৃষ্ট হতে লাগলেন।

এদিকে এত আনন্দ, ওদিকে কিন্তু ঠাকুরের গলার অসুখ একটুও কমছে না; বরং বেড়েই চলেছে। ডাক্তারের পরামর্শে ঠাকুরকে কলকাতা থেকে কাশীপুরে একটি বাগানবাড়ীতে এনে রাখা হয়েছে। ফাঁকা জায়গায় থাকলে অসুখ শীঘ্র শীঘ্র সারবে এই আশায়। গৃহী-ভক্তেরা সর্বদাই আসেন ও দেখাশোনা করেন। ব্রহ্মচারী ভক্তেরা তো সেইখানেই রয়েছেন, দিনরাত ঠাকুরের সেবা করছেন। ঠাকুর অসুখের মধ্যে থেকেও ভক্তদের ধর্মোন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখেছেন।

যে ভক্ত যা চান, তাই তিনি অমানুষী শক্তিবলে পূরণ করে দিচ্ছেন। এদিকে অসুখের বৃদ্ধি হচ্ছে, ওদিকে ভক্তদের নানা ভাবের বিকাশ দেখাচ্ছেন।

দিন যায়, ঠাকুরের কিন্তু অসুখ ভাল হবার কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। সকলেই মহা উদ্বেগের মধ্যে পড়লেন। ব্রহ্মচারী তরুণ ভক্তের দল এখন দিনরাত ঠাকুরের কাছেই থাকেন। নরেন্দ্রনাথ এঁদের নিয়ে পালা করে ঠাকুরের সেবা করেন। তীব্র বৈরাগ্য তাঁর মনে। তিনি সংসারের সবকিছু মন থেকে সরিয়ে ফেলে নিজেকে সমর্পণ করে দিলেন গুরুর কাছে, আর তীব্র একাগ্রতা নিয়ে গুরুর আদর্শে কঠোর সাধনায় রত হলেন। গুরুও তাঁকে তৈরী করতে থাকেন, নিজের মতো করে। নরেনের জন্যেই তো সব। সাধনার বলে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকেন নরেন্দ্রনাথ।

ঠাকুরের ভাবগতিক দেখে নরেন বুঝতে পেরেছেন যে ঠাকুর আর বেশীদিন তাঁদের মধ্যে থাকবেন না। এই কথা একদিন তাঁর গুরু-ভাইদের বলে ফেললেন।

আর বললেন, 'ঠাকুর থাকতে থাকতে এইবেলা সকল বন্ধন ঘুচিয়ে দিয়ে যে যা পারি করে নিই আয়। নইলে এরপর আপশোষের সীমা থাকবে না।"

নরেনের কথায় সবারই চৈতন্য হয়, সাধন-ভজনে সকলেই প্রাণপণে লেগে যান। গুরু-ভাইদের নিয়ে ধর্মালোচনা করেন, পাঠ করেন আর ধুনি জ্বালিয়ে সমস্ত রাত্রি ধ্যান করেন।

নরেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে বাড়ী যান। তখন তিনি বি, এল্ পড়ছেন। দিদিমার বাড়ীতে তাঁর সেই পড়বার ঘরে গেলেন। কিন্তু পড়তে বসে একটা ভয়ানক আতঙ্ক এলো। পড়াটা যেন কি ভয়ংকর জিনিস! বুক আকু-পাকু করতে লাগলো।—আর সে কি কান্না! অমন কান্না কখনো কাঁদেন নি।

তারপর বই-টই ফেলে রাস্তা দিয়ে ছুট। জুতো-টুতো রাস্তায়

কোথায় একদিকে পড়ে রইলো।—তিনি দৌড়ুচ্ছেন কাশীপুরের রাস্তায়।

নরেন ভাবলেন—অনেক তপস্যার ফলে মানুষ জন্ম হয়েছে—অনেক তপস্যার ফলে মুক্তির ইচ্ছা হয়েছে—আর অনেক তপস্যার ফলে এরূপ মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হয়েছে।"

সেই থেকে নরেন বাড়ী যাওয়া একেবারে ত্যাগ করলেন। অন্য গুরু-ভাইয়েরাও একে একে বাড়ী যাওয়া বন্ধ করেছেন। নরেনের মনে যেরকম ত্যাগ বৈরাগ্যের উদয় হয়েছে, তা খুব গভীর! তিনি বুঝেছেন যে ত্যাগ দরকার। ত্যাগ না করলে কিছুই হবে না।

এদিকে দিন ঘনিয়ে আসছে। শিষ্যদের ধর্ম শিক্ষার দিকে তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছেন। একদিন নরেনকে ডেকে বললেন—"আজ তোদের একটা কাজ করতে হবে। আজ তোরা সবাই ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভিক্ষে করে আয় দেখি। শিষ্যেরা বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায় ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে বিনা দ্বিধায়।

উপহাস, বিদ্রূপ, উপদেশ এইসব শুনতে শুনতে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা চেয়ে ফিরলেন নরেন ও তাঁর গুরু-ভাইয়েরা। এই হোল তাঁদের নব-জীবনের সূচনা। সেদিন সেই ভিক্ষার অন্ন সবাই খেলেন আনন্দ করে।

তারপর একদিন কতকগুলি গেরুয়া কাপড় এনে ঠাকুরের সামনে রাখা হোল ঠাকুর তরুণ শিষ্যদের প্রত্যেককে নিজের হাতে একখানি করে গেরুয়া কাপড় তুলে দিলেন আর দীক্ষা মন্ত্র দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

সূত্রপাত হলো জীবনের গতি ভিন্ন পথে যাবার। সুরু হল নূতন জীবন—যা উৎসর্গ হবে সকলের জন্য।

তারপর আর একদিন। নরেন ও তাঁর গুরু-ভাইয়েরা ঠাকুরকে ঘিরে বসেছেন। সবাইকে দেখিয়ে ঠাকুর বললেন—"এদের সকলের ভার রইলো তোর উপর। এদের তুই—চালাবি, শিক্ষা দিবি, দেখবি।"

ঠাকুর বেশ জানতেন, ভাব-সমাধির চরম স্তরে পৌঁছুলে নরেনকে দিয়ে সংসারের আর কোন কাজই করানো যাবে না। তাই চাবি রাখলেন নিজের কাছে।

দিনের পর দিন চলে যায়। প্রায় সাত-আট মাস গত হোল। অসুখ বাড়তেই থাকে। ভক্তেরা সবাই প্রাণপণে সেবা করছেন। চিকিৎসারও বিরাম নেই। কিন্তু কোনও ফল হচ্ছে না। শরীর তাঁর অস্থিসার হয়ে গেছে। আর বুঝি টেঁকে না।

একদিন ঠাকুর নরেনকে ডেকে পাঠালেন। নরেন এলেন। অন্য সকলকে ঠাকুর বাইরে যেতে বললেন। নরেনকে সামনে বসিয়ে একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন আর ধ্যানস্থ হলেন। নরেনের মনে হতে লাগলো যেন এক তড়িৎশক্তি দ্রুত তাঁর শরীরের মধ্যে প্রবেশ করেছে। কারণ সংজ্ঞা হারালেন।

জ্ঞান হলে পর অনুভব করলেন, নিজের ভেতর এক অলৌকিক শক্তির ব্যঞ্জনা। কিন্তু দেখলেন ঠাকুর বিষন্ন। চোখ দিয়ে তাঁর জল পড়ছে।

অবাক হয়ে নরেন জিজ্ঞাসা করলেন—"কাঁদছেন কেন?" শিষ্যের হাত ধরে ঠাকুর বললেন—'ওরে, তোকে আমার সব দিয়ে আজ আমি ফকির হলাম। নিজের কিছুই আর রাখি নি। আমার সমস্ত শক্তি উজাড় করে তোর ভেতর ঢেলে দিয়েছি। এর-ই বলে তুই বিশ্ব বিজয় করবি।

গুরু শিষ্যের দেওয়া নেওয়া পালা শেষ হোল এইভাবে। এরপর মহাসমাধির সেই মহাক্ষণটি। ১৮৮৬ সালের ১৫ই আগস্ট, রবিবার সন্ধ্যাবেলা। শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার সমাধিস্থ হচ্ছেন।

নরেন ভাবছেন এই শেষবার যদি উনি একবার বলতেন যে উনি ভগবান, তাহলে আমার মনোবাসনা পূর্ণ হতো। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর চোখ মেলে বললেন,—তোর সন্দেহ এখনো গেল না? ওরে যে রাম, যে কৃষ্ণ, একদেহে সেই রামকৃষ্ণ।

নরেন স্বীকার করলেন—ইনি নিশ্চয় সেই অন্তর্যামী নারায়ণ।

এবার অনেকক্ষণ ধ'রে সমাধিতে রয়েছেন। অনেকক্ষণ হয়ে গেল ভক্তেরা দারুন উৎকণ্ঠায় প্রতীক্ষা করছেন, কখন সমাধি ভঙ্গ হয়। কিন্তু এবার তিনি মহাসমাধিতে ডুব দিয়েছেন। এ সমাধি আর ভাঙ্গলো না—'ভাবসাগরে' এবার যে ডুব দিলেন, আর উঠলেন না। ভাবের যে শতমুখী ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল এতদিন ধ'রে. আজ তা স্তব্ধ হোল।

এ যে শুধু দেহ হতে দেহান্তরের খেলা। ভাবরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন নরেন্দ্রনাথের মধ্যে—গুরু এলেন শিষ্যের মধ্যে। ওখানে যার শেষ এখানে তার আরম্ভ,—বিকাশ—আর পরিণতি।

শ্রীরামকৃষ্ণের বিচিত্রতর বিকাশ ও পরিণতি নরেন্দ্রনাথের মধ্যে, যিনি উত্তরকালে বীর বিবেকানন্দ হয়ে বিশ্ব বিজয় করে বেড়িয়েছিলেন।

ঠাকুর, তোমার লীলার আদি নেই, অন্ত নেই। তবুও এখানে শেষ করতে হলো তোমার লীলা বর্ণনা। সবশেষে তোমারই শ্রীচরণে আমার যা কিছু সব অর্পণ করলাম।

স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে
অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ